

ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ଲାଭ

(ସାମାଜିକ-ଉପଦ୍ଵାନ)

ବିବିଧେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଲ ପ୍ରଣୀତ ।

ପ୍ରକାଶକ

ବିବିଧେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷ ।

୨୦୫।୨ ନଂ କର୍ମଓଫିସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍

କଲିକତା ।

ମୂଲ୍ୟ ୨।୦ ପାଞ୍ଚ ମିକା ।

Copyrighted by
BARENDRA NATH GHOSH.
10th May 1916.

Printed by—
KULA CHANDRA DEY,
Sastha Prachar Press,
5, Chidammudi Lane, Calcutta.

বিজ্ঞানার স্নেহাশীষ ।

স্নেহান্বিত ত্রীমাম্ নরেন্দ্রকুমার বসু ।

নরেন ।

আমার পুস্তক পড়িতে তুমি বড় ভাল বাস, আমায়
পুস্তক বন্ধে সূর্য্যপ্রথম তুমিই সংগ্রহ কর তাই আমার বড়
সাধের লক্ষ্মী-লাভ তোমাকেই উৎসর্গ করিলাম । আমার
স্নেহের এই ক্ষুদ্র নিদর্শন,—আমি জানি তোমার গৌরবের
সামগ্রী হইবে । ইতি :—

বিজয়া ১৩১৭

কলিকাতা ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল ।

(যন্ত্রস্থ)

মায়ের পুকুরের সোণার পদ্ম

পারিবারিক উপস্থাপন

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

সতীর স্বর্গ ।

বাল্যাবতারের কথা—বাল্যজীবনের নিজের জিনিষ,—

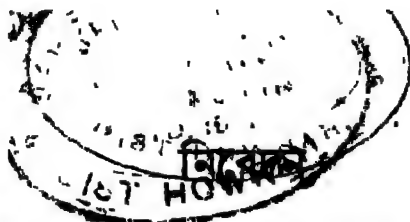
আনন্দ ও অশ্রুর প্রীতিময় কাহিনী শ্রীযতী

প্রকাশিত হইবে ।

স্মৃতি-পৃষ্ঠা

এই পুস্তকখানি প্রদান করা হইল ।

তারিখ -



আজ ছয় বৎসর পরে স্বর্গীয় পিতৃদেবের শেষ উপকৃত লক্ষ্মী-লাভ প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকখানি স্বর্গীয় পিতৃদেবের নিজেরই প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল,—কিন্তু দৈব নির্বন্ধে তাহা ঘটয়া উঠে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর সাংসারিক নানা দুর্ঘটনায় পুস্তকখানি এতদিন প্রকাশিত হয় নাই,—সম্প্রতিও হইবার সম্ভাবনা ছিল না,—কেবল বরেনবাবুর আগ্রহাতিশয্যে ইহা প্রকাশিত হইল। এতদিনে স্বর্গীয় পিতৃদেবের বড় সাধের,—বহু বয়ে লিখিত শেষ উপকৃত “লক্ষ্মীলাভ” যায়ের চরম। অল্পলী প্রদান করিলাম,—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, “লক্ষ্মী-লাভ” নিশ্চয়ই যায়ের অকলতলে তাহার সম্মায়তন স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইতে পারিবে।

বাঁহার আশালতা, ভ্রমর সংকরণের পর সংকরণ মুক্তি হইয়া বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে শোভিত হইতেছে,—বাঁহার উপকৃতে বঙ্গ-সাহিত্য একরূপ প্রাবৃত হইয়া রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—তাঁহার উপকৃত সম্বন্ধে অধিক কিছুই বলিবার নাই। “লক্ষ্মী-লাভ” সহর ও পল্লীর স্বরূপ চিত্র। আমাদের ঘরের কথা,—নিজের ছবি। ইহাতে উপকৃতির অস্বাভাবিক নায়ক নায়িকার প্রেম নাই—অসংযত অসংলগ্ন বাক্যের আড়ম্বর নাই—বিলাতি সৌগন্ধের ছড়াছড়ি নাই,—আছে কেবল যেদির বেড়া,

—পুরুষ ডোবা—আকাশলক্ষী বাঁশঝাড়—শস্ত্র শ্রায়ল ধাতু-
ক্ষেত্র—আর ধূপ ধূনার সৌগন্ধে উদ্ভাসিত পবিত্র হিন্দুগৃহের
অপূর্ণ শোভা। গ্রন্থকারের অপূর্ণ কল্পনা নিশিবাবু সত্যই এক
নূতন সামগ্রী।

পরিশেষে, এই পুস্তকখানি অর্থব্যয় ও যত্নের কার্পণ্য না
করিয়া এরূপ সুচারুভাবে প্রকাশ করা বজ্র আঘাত বয়েনবাবুকে
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহার উদ্যম ও যত্ন না
থাকিলে এত শীঘ্র এ পুস্তকখানি প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ।

১৩ই মে ১৯১৬

কলিকাতা।

}

বিনয়াবনত—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

প্রথম খণ্ড
আড়ম্বর



“হেডেদে স্ত, গাভী মিস্ হবে।”

(দশী পাত—পৃ: ১১)

লক্ষ্মী-লাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছাত্রাবাস

এটা ২০ নং আবহাউট স্ট্রিটের “পেন্স।” উপরের কারালা হইতে দুই দশখানি রং বেয়ংয়ের কাগজ বুলিতেছে। ভিতর হইতে সুপরিচিতা শ্রদ্ধা সন্ধ্যা-বাজার-কাগজী, চৌধুরীবিজ্ঞান, পারদর্শিনী, স্থল-কাগজ, নাতিঘোষনা, চাকচিক্যমাত্রা “কির” গল্প প্রভৃতি হইতেছে। ঘরে ঘরে বিবিধ ভাবের কেওড়া কাঠের তক্তপোষ শোভা পাইতেছে। পার্শ্বে অর্ধতর হেলানমান এক একখানি টেবিল;—তহপরি ক্রমশঃ সুশোভিত চন্দ্রপ্রভা চিনিধারী কেরোসিন ল্যাম্প। চারিদিকে ইংরাজি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অক্ষপাত ইত্যদ্যঃ বিকিণ্ড। ছাত্রদল কেহ সীরবে, কেহ উচ্চৈঃস্বরে;—কেহ গুণ গুণ করে, কেহ পৌ পৌ, রবে,—বার্ক, গেলখিয়র, রকো, জানো প্রভৃতি উদরর করিবার অল্প বহুগরিকরে মিশ্রিত আছেন। কেহ কেহ বা সন্ধ্যা-বাজার সিঁড়িতে উদীয়মান খাবারওয়ালার শালপাতা-আবরণিত স্তম্ভের গোড়ায় প্রতি লোল লিহ্নায় ব্যাসুল নয়নে চাহিতেছেন।

লক্ষী-লাভ

প্রায় সন্ধ্যা হয়;—মধ্যে মধ্যে “কি—কি” রব উপর হইতে শ্রবিত হইতেছে। হেলায়-দোলারমানা, বাকবাঁধী, চিরহাস্তময়ী, হাবভাবে গরবিনী কি “ম্যানেজার-বাবু”কে লল খাওয়াইয়া মুক্ত-হস্তে কিপ্র পদে চারিদিকে পান ও জল বিতরণ করিয়া নাশিতেছে। তৎপশ্চাতে লাল খাতা কক্ষে ছোটমুণ্ডে খাবারওয়ালার তাহার বুড়ির সার অসার অন্নবোগের আধারগুলি নিঃশেষ করিয়া বাবুদিগের কেবল “সহি” লইয়া ফিরিতেছে। নিরে “ঠাকুর,” বুলনুশোভিত পাকশালের প্রজ্জ্বলিত উনানে মুগ-মুটিকে তোলোড়গী অতল সাগরে ভাসাইয়া বর-বর-নিবরিণী কল-স্রোতবিনীর পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত চৌবাচ্চারূপ স্থানস-সরোবর তীরে বেলিয়াখাটার বাল্য পরিধৌত করিতে করিতে দম্বরির প্রত্যাশার হুঁত্যা খাবারওয়ালার প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাহির হইতে “বাবু বরফ চাই” বলিতে বলিতে খাবারওয়ালার নীরব অপ্রকাশিত হৃৎকের কারণানভিজ বরফওয়ালার কুলিরগী ধার নামক সর্প তাহার হাঁড়ী হইতে ছাত্রবৃন্দের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে আসিতেছে।

একশ্রেণে বাবুরা স্বাস্থ্যবিধায়ক ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম দ্বিত্য প্রয়োজনীয় বিবেচনার কেহ কেহ গোলদীঘির দিকে প্রবল-বেগে পরিধাবমান হইয়াছেন। তাহার কেহ শতবার, কেহ দুই শতবার,—বাঁহাৰ বেঙ্গপ পরিভ্রমণ স্থির—নির্দিষ্ট আছে, তদনুসরণ সেই স্তম্ভর সুপরিষ্কৃত পুষ্করিনী, প্রদক্ষিণে নিযুক্ত হইতেছেন।

ছাত্রাবাস

কেহ কেহ বা ফুটবল প্রকৃতি ক্রীড়া ক্রীড়নে বা দর্শনে উৎস্রীষ
হইয়া হেটমুণ্ডে গৌঁত্রে কলিকাতার গড় নামঘের স্রবিস্কৃত
নাঠের দিকে ছুটিয়াছেন। কেহ কেহ বা পুস্তকহস্তে দূর-পরি-
দৃষ্টমান চগমা চক্ষে ছাদরূপ বায়ুসেবন স্থলে ধীরে ধীরে প্রয়াণ
করিতেছেন। তথায় পাদচারণে ব্যায়াম,—এবং দূরস্থ ছাদশোভিনী
অবলাকুলের পর্য্যবেক্ষণে পার্শ্ব-প্রজ্ঞতা—এ উত্তর কার্য
স্বসম্পন্নর সম্ভাবনা আছে। ষাঁহার শারীরিক অপেক্ষা মানসিক
উৎকর্ষসাধন প্রেরণঃ বিবেচনা করেন, তাঁহার ক্রটিভেদে কেহ
ধর্মোন্নতিবিধায়িনী, কেহ সমাজসংস্কারিণী, কেহ রাজনৈতিকী সভা-
মণ্ডপের বেকিশ্রেণী-পরিশোভিত করিতে চলিয়াছেন। এইরূপে
ক্রমে সেই ভবিষ্যৎ-উকিল-ডাক্তার-কেরানী-প্রসবিনী “বেস”-
স্বন্দরীকে কলিকাতার ধুমবাস-পরিধানা নিম্নীধিনী আসিয়া ধীরে
ধীরে ঘেরিল।

রাত্রি আট ঘটিকা কালে এই “বেস” গৃহের সোপান শ্রেণীতে
চট্ চট্ পট্ পট্ শব্দ বোর রোলে উঠিল;—সে মহাশব্দে সমস্ত
গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। বাহিরে রাজপথস্থ লালপাগড়ীঘারী,
গোলমাল-দেখিলে-দূরে-অপসারণকারী, গাড়োরানের বনকপী
পাহারাওয়াল চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিল। ঠাকুরের
“পাত হয়েছে আশুন” শব্দ শুনিয়া তালতলাঠনঠনে-প্রহৃত
বাবুদিগের পদস্থিত চটিসমূহ সোপানশ্রেণীতে আঘাতিত প্রঘাতিত
হইয়া এইরূপ নিনাদ করিয়া উঠিল। সর্বদা-সুখ-প্রাপ্তিভিত্ত বেস-

লক্ষ্মী-লাভ

বাসিগণ ঠাকুরের বর্ষপরিমিশ্রিত তরল ডাল ও তরলতর বোল-টুকু উদরস্থ করিবার জন্ত এতই ব্যগ্র হইয়া ছুটিলেন যে, অন্তরীক্ষবাসী দানবকুল ভাবিল, তাহারা যদি পুরাকালে অমৃত লাভের জন্ত একরূপ ব্যগ্র হইত, তাহা হইলে তাহাদের হস্ত হইতে কোন ক্রমেই সে ত্রিদিববাহিত পরম-বস্তু বাইত না।

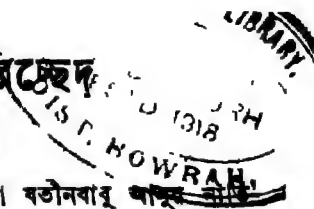
অর্দ্ধ আহার হইয়াছে,—“ঠাকুর, ভাত নিয়ে এস,” “ঠাকুর, জল এঁই দিকে,” “ঠাকুর, দমের একটা আলু দাও,” এইরূপ ও নানারূপ রব উঠিতেছে,—ঠাকুর একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে, হাতা হস্তে ছুটিতেছে,—এইরূপ সময়ে ঘারে শব্দ হইল, “বাবু, তার আয়া।”

সেই সর্বদা আত্মীয়-স্বজনদের কঠিনব্যাধি সংবাদ-জ্ঞাপক তারের আগমন সংবাদে সহসা সেই রাজনৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক নানা কথোপকথনে নিযুক্ত ডাল-ভাত-দম-অন্তর্ধানকারী ছাত্রবৃন্দ মধ্যে নিম্নকৃতার মেঘ পড়িল ;—সপ্ সপ্ চপ্ চপ্ শব্দ ঘুচিল ;—হাতের দম হাতে রহিল ;—মুখের গ্রাস মুখে থাকিল,—সকলেই উৎকণ্ঠিত—উদ্গ্রীব,—ভীত—ব্যাঙ্কুলিত,—অনেকে আসন হইতে উখিত, অর্দ্ধ উখিত ; কাহারও কাহারও কণ্ঠের কথা কণ্ঠেই রহিল,—বাহির হইল না। কেহ কেহ ব্যগ্র ভাবে বলিলেন,—“কার ? কার ?”

কি টেলিগ্রাফটি আনিয়া বারনিকটস্থ বাবুর হস্তে দিল ; তিনি শিরোশায়া পড়িয়া বলিলেন, “বতীনের।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ



গৃহের এক কোণে উপবিষ্ট হইয়া বতীনবাবু আত্মনিবেশিত
সিদ্ধ দম যুগে ভুলিতেছিলেন,—সহসা তাঁহার নাম উচ্চারিত
হওয়ার, তদবস্থায় বিস্মারিত নয়নে দ্বারাভিমুখে চাহিয়া কল্পিত
কণ্ঠে বলিলেন, “কার ?” একজন বলিলেন, “তোমার।”
ঝোলাসিক্ত তরলতর ডালমিশ্রিত মাখা ভাত সেই অবস্থায় কেলিয়া
তৎক্ষণাৎ বতীনবাবু উঠিলেন। পিয়ন দ্বার হইতে চীৎকার
করিয়। বলিল, “বাবু, সহি দি জিরে।”

বতীনবাবু সত্বর আচমন কার্য শেষ করিয়া টেলিগ্রাফটি হস্তে
লইয়া তিন লক্ষে সোপানশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া উপরে উঠিলেন।
কিয়ৎক্ষণ গৈরে মি রসিদ আনিয়া পিয়নকে প্রত্যর্পণ করিল,—
তখন নিম্ন হইতে উদ্গ্রীব বহুগণ ডাকিলেন, “ও বতীন, খবর
কি ?” উপর হইতে কোন উত্তর নাই।

তাঁহার। সকলেই কেহ অন্নপিণ্ড গ্রাস করিতে করিতে,—
কেহ আহারীয়পূর্ণ যুগে অস্পষ্ট অব্যক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিতে
লাগিলেন,—“কোথাকার টেলিগ্রাফ ?” “কে পাঠিয়েছে ?” “কার
অনুষ্ঠ ?” “কি খবর ?” “কথা কওনা কেন ?” কিন্তু বহুদিনের
এ প্রশ্ন-বৃষ্টির কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। তখন কেহ কেহ
আহার ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং কেহ কেহ সত্বর উঠিবার
অন্ত অবশিষ্ট ভাত বারুবেগে অন্তর্হিত করিতে লাগিলেন ;—কেবল

লক্ষ্মী-লাভ

নিশিবারু অবচলিত ভাবে চিরাভ্যাসাহুযায়ী ধীর গতিতে ভোজনকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন, তিনি বিচলিত হইবার লোক নহেন ; একবার মাত্র বলিলেন,—“বতীনটা চিরকালই পাখা।”

যখন বহুগণ চৌবাচ্চা পরিবেষ্টন করিয়া সকলে ক্ষিপ্রহস্তে আচমন-কার্য্য শেষ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কি আসিয়া সেই ছাত্রস্বশ্বের শাস্তিভঙ্গ-কারিণী, ব্যাকুলতা-প্রদায়িনী, কোতূহলোদ্দীপনী তারনারী বার্তাবাহিকাকে ম্যানেজারবাবুর হস্তে দিল। তিনি আলোর নিকট আসিয়া ব্যগ্রচিত্তে পাঠ করিলেন ; হাসিয়া বলিলেন, “এই ব্যাপার—কি যত্নগা ! আমরা সকলেই ভেবে-ছিলাম, বুঝি কার ব্যাম।”

একবাক্যে সকলেই বলিয়া উঠিলেন,—“তবে ‘কি ? তবে কি ?’”

তিনি বলিলেন, “বতীনের বে।”

“বে !” “সে কি।” “বতীন বে কখন বে কর্বে না !” “ওর গুপিনিয়ন বে ম্যারেজের বিরুদ্ধে !” এইরূপ ও নানারূপ সম্ভব্য চারিদিক্ হইতে উদ্ভূত লাগিল। সকলেই তখন আলোর নিকট লইয়া গিয়া সেই গুপ্তপরিণয়জ্ঞাপক টেলিগ্রাফটি এক একবার দেখিলেন। বতীনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লিখিতেছেন :—

“সম্বর রওনা হও। ২০শে তোমার বিবাহ হি়র হইয়াছে।”

বহুদূর সকলে আসিয়া বতীনকে দেখিলেন। সপ্তরথী পরি-

বেষ্টিত অভিমত্যা অপেক্ষাও বতীনবাবু বহুদিগের প্রশংসা বর্ষণে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। “কি কর্কে?” “বাবে নাকি?” “এইবার হুংগ অব্ মাইও বুঝবো!” এক পক্ষ হইতে এইরূপ, .ও অপর পক্ষ হইতে “বাওয়া খুব উচিত।” “সেইতো ক’র্তে হবে, তবে আত্মীয় স্বজনের মনে ব্যথা দেওয়া কেন?” “সব ঠিক হয়েছে, এখন না বাওয়া কি ভাল?” এইরূপ বহুবিধ যন্তব্য, মত, ওপিনিয়ন ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। বতীনবাবু কোন উত্তর দিলেন না,—দিবার অবসরও পাইলেন না। “বিবাহিত জীবন ভাল কি অবিবাহিত জীবন ভাল?” “বালিকা বিবাহ ভাল না সুবতী বিবাহ ভাল?” “হিন্দু প্রথা ভাল কি বিলাতী-প্রথা ভাল?”—সকলে এইরূপ দুই পক্ষে নানা তর্ক বিতর্ক বাক্য-বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন,—ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে সেই বাক্য-বুদ্ধিতে কোমটী, ভল্টেমায়, মিল, স্পেনসার যেকিয়াভেলি প্রভৃতি আনীত হইল। পার্শ্বস্থ প্রতিবেশিগণ “মেনে আজ কি হইল” অবগত হইবার জন্য কারণানুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলেন। বাঁহাকে লইয়া এই তুমুল সমর, তিনি নীরবে গৃহকোণস্থ লম্বমান রজুপরি দোলায়মান সাটুটী ও চাদরখানি লইয়া গমনোদ্যত হইলেন; তখন .সকলেই বলিয়া উঠিলেন, “কোথার বাও?” “একবার ললিতের সঙ্গে দেখা ক’রে আসি” এই কথা বলিয়া বতীন অতি সঙ্কর তথ্য হইতে প্রস্থান করিলেন।

ললিত তাহার প্রাণের বন্ধু। এ ঘোর সঙ্কটে প্রাণের বন্ধু

লক্ষী-লাভ

ললিতের সহিত পরামর্শ ব্যতীত তিনি অনন্তগতি । তাই স্পষ্টত
হৃদয়ে সেই রাত্রিকালেই নানাভাবে হৃদয়পূর্ণ বতীনরূপ ভবিষ্যৎ
বি, এ, কলিকাতার রাজপথ দিয়া তীরবেগে বহুসন্নিধানে
চলিলেন । রাত্রি প্রায় ১০টা । রাজপথে মল্লভ্য সমাগম হ্রাস হইয়া
আসিতেছে ;—সমস্ত দিবসের দারুণ কবাঘাতে প্রপীড়িত ক্রান্ত
পরিত্রান্ত তৃতীয় শ্রেণীর অধিনীত অর্দ্ধহস্ত পরিমিত জিহ্বা
বিলম্বিত করিয়া পশ্চাত্ত্ব অস্থি বিচূর্ণকারিণী বন্বন্ নিনাদিনী
রথখানি টানিয়া কায়ক্লেশে আন্তাবলরূপ শান্তিনিকেতনে
চলিয়াছে । পানওয়ারালার দোকানের আলো ক্রমে ভিত্তিত হইয়া
আসিতেছে । সহরে লক্ষ নরনারীর পদধূলিতে পবনদেব কর্তৃক
পরিশোভিত হইয়া শিশুদিগের প্রিয় কুচোগজা,—ছাত্রদিগের
বস্তকষ্পর্নকারী রসগোল্লা,—কেরাণীবাবুদিগের স্বাস্থ্য বিনাশ-
কারিণী কচুরী,—সমস্ত দিবসের পরে বাঁপ অন্তরালে অবস্থিত
হইতে চলিয়াছেন । ক্রমে লক্ষকণ্ঠে আলোড়িতা কলিকাতা
মহানগরী শান্তির জোড়ে বিরাম লাভ করিতেছে ।

ললিতের বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ । অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির
পর ললিতের পৈত্রিক আমলের প্রাচীন ভূত রামচন্দ্র গুরু
রানা আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিল । কিছু গাঢ়ি তাহার কণ্ঠ
হইতে ওষ্ঠ পর্যন্ত আগমন করিয়া এতরায়ে বিরক্তকারী
পাপান্দার অভ্যর্থনায় প্রস্তুত হইয়া ছিল,—কিন্তু সম্মুখে বতীনকে
দেখিয়া সে চৌক গিলিল,—গালিরাশি উদয় হইয়া ভিতরেই

বিবাহ'

রহিয়া গেল। বতীন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ললিত কি বুঝিয়েছে?” রাম বলিল, “এতক্ষণ রাণাঘাট পার!” বতীন আশ্চর্য্যাবিত হইয়া বলিলেন, “রাণাঘাট পার! সে কি?” রাম বলিল, কর্ত্তা মরণাপন্ন। এইমাত্র তারের ধবর পেয়ে বাবু বাড়ী রওনা হ’লেন। আট্টার গাড়ীতে গেছেন।”

বতীন ফিরিলেন। তাঁহার প্রাণের বন্ধু বিপন্ন,—আর তাঁহার বিবাহ! ললিত পিতৃহীন হইতে চলিয়াছেন,—আর তিনি পিতা হইতে বাইবেন! ইহা কি ঘোর বিসদৃশ হইবে না! এ সংসার কি এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতিতে গঠিত? একদিকে অমানিশা,—জুগেরদিকে জ্যোৎস্না-বিধৌত পূর্ণিমা,—মানব জীবন কি এই নিয়মে পরিচালিত? এই সকল গভীরদার্শনিক চিন্তার চিন্তিত মনে ধীরে ধীরে বতীনবাবু বাসার দিকে ফিরিতেছিলেন। তিনি বিমনা,—একখানা গাড়ী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া প্রায় তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়াছিল,—তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে কোচমানেসের চীৎকারে তিনি লক্ষ দিয়া হুটপাথে উঠিলেন। অতিকষ্টে প্রাণ ঝাঁচিল,—এখনই বিবাহ শেষ হইয়াছিল! তাঁহার বুক সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। গাড়ীখানা ভীরবেগে পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। ভিতর হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিল, “তাই বতীন,—তাই বতীন, এরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে,—বলে ওয়ারেন্ট আছে। তাই, আমার বড়, বিপদ,—তাই, আমার বড় বিপদ—”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বঙ্কুলাভ

ষতীন ও তাঁহার বন্ধু ললিতবাবুর পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।
ষতীনবাবু বি, এ, পড়িতেছেন,—তাঁহার বৃদ্ধ পিতা নরসুন্দর বন্থ
মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেল আফিসে
কলম পিষিয়া এক্ষণে বাটীতে ৫০ টাকা-পেনসন-রূপ কেরানীর
বার্দ্ধক্যের একমাত্র ভরসা উপভোগ করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র
জীমান্ বরেন্দ্র পশ্চিমে রেল আফিসে একটি চাকরী পাইয়াছেন,
—নরসুন্দরবাবুকে সাহেব বড়ই ভাল বাসিতেন; তাই তিনি
চাকুরী পরিত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বরেন্দ্রকে তিনি ৫০
টাকা মাহিনার একটি চাকুরী দিয়াছেন। চাকুরী হুখুলা,—সহজে
যেলে না; কাজেই কলেজ ছাড়িয়া সেই চাকুরী লইয়া বরেন্দ্র
পিতার পদধূলি সঞ্চল করিয়া রেলের পাস পকেটে ও টিকিট
সঙ্গে পশ্চিমে প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার বালিকা জী ললিতা
গৃহের অর্দ্ধোদ্বৃত্ত দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অবগুষ্ঠনাভাষ্যে সজল-
গোলালো নয়নে ব্যাকুল ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।
তাঁহার নিজ জননীসমা বিমাতা লাবণ্যময়ী, অকস্মে চক্ষুর জল
ঝুঁটিতে মুছিতে বলিলেন, “বরেন, রোজ এক একখান চিঠি
লিখিতে ভুল’না।” বৃদ্ধ বন্থ মহাশয় গভীরে ভামাহু সেবন
করিতেছিলেন,—চক্ষে যে জলরাশি ধীরে ধীরে জমিতেছিল,

তাহা অপ্রকাশিতকরণাভিলাষে তামাকু ধূমে সর্বদা আবরিত করিতেছিলেন। বরেন্দ্র আসিয়া পদধূলি লইয়া “বাবা, তবে এখন বাই” বলিলে, তিনি ছুই চারিবার কাসিয়া কুঙ্ককণ্ঠ পরিহারকবণান্তর বলিলেন, “হাঁ,—টোপের সময় হ’লো।” বরেন্দ্র-বাবু বাইতেছিলেন,—তাঁহার নবম বর্ষীয়া একমাত্র ভগিনী সুপ্রিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিল। তাহার অর্ধহুঙ্কিত বন্ধ-পর্যন্ত বিলম্বিত উন্মুক্ত কেশরাশি তাহার সুন্দর মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিতেছিল,—বরেন্দ্রবাবু তাহা সাদরে সরাইয়া বলিলেন, “ছেড়ে দে সু,—গাড়ী মিস্ হবে।” সু বলিল, “আমার জন্তে কান্নীর খেলনা আনবে বলো।” “আনুব” বলিয়া বরেন্দ্রবাবু হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে লুকাইয়া চক্ষের জল চক্ষে মিশাইয়া, পদর পদে সেই সুখবর আবাসস্থল ও চিরশান্তি-নিকেতন গৃহ ছাড়িয়া একাকী বিদেশে অর্ধাহুসন্মানে চলিলেন। সেই গিয়াছিলেন,—তাঁহার পর এক বৎসর পরে এক মাসেক ছুটি লইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

বরেন্দ্র ও বতীনকে রাখিয়া বন্ধু মহাশয়ের গৃহিণী স্বর্গদ্বাষে গিয়াছিলেন। ৫৬ বৎসর বন্ধু মহাশয় আর দ্বিতীয় দ্বারপরিগ্রহের কথা ভাবেন নাই;—পরে নানা কারণে,—বিশেষতঃ মাতৃহীন বালক দুইটির বন্ধ হইয়া না দেখিয়া,—অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রেমময়ী লাভণ্যময়ীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিলেন। লাভণ্য যে বিয়াতা, তাহা বরেন্দ্র ও বতীন্দ্র জানিতেন না,—

লক্ষী-লাভ

লাবণ্যও তাঁহাদিগকে ঠিক নিজের ছেলের মত দেখিতেন। তাঁহার একটা মাত্র কন্যা হইয়াছিল,—সুপ্রিয়া। বৃদ্ধ বনু মহাশয় তাহারই জন্য একটা সুপাত্রেয় সন্ধানে ছিলেন,—বতীনের বিবাহের কোন কথাই ছিল না।

ললিতপ্রকাশবাবু বড় লোক,—জমিদারের ছেলে;—পিতার একমাত্র পুত্র। তাহার পিতা রাম রাম চৌধুরী মহাশয়ের বৎসরে লক্ষাধিক টাকা আয়। নদীয়া জেলার মধ্যে তিনি একজন প্রধান ধনাঢ্য ব্যক্তি, কত গাড়ী বোড়া, কত দাস দাসী,—কতই বা হাতী! বাড়ীটা একটা প্রকাণ্ড গ্রাম বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। চৌধুরী মহাশয়কে সকলেই, বিশেষ ভক্তি মান্ত করিত, পত্ৰপত্র কয়েকবার তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদানে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বহু কষ্টে কিছু ব্যয়ভরণ করিয়া সে বিষয় সমস্তা হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহাকে “চৌধুরী মহাশয়” বলিয়া ডাকিলেই তিনি বিশেষ প্রীতি অনুভব করিতেন। তাঁহার দানের পরিসীমা ছিল না,—তাঁহার জমিদারীতে দীন দুঃখী নাই,—তিনি প্রজাদিগকে সম্মান-নির্বিশেষে স্নেহ করিতেন,—তাঁহার দানের সংবাদ তিনি ব্যতীত আর কেহ জানিত না।

চৌধুরী মহাশয়ের কোন দুঃখ ছিল না। তাঁহার গৃহিণীকে স্বয়ং লক্ষী বলিয়া সকলে বিবেচনা করিত। পুত্র ললিতপ্রকাশও বড় ভাল ছেলে। বড়লোকের ছেলের মত উন্নত-টোড়ি, সুল-কোঁচা,

এসেন্স-আধার নহেন। বতীনের জায় তিনি ৩।৭,এ, পড়িতেছেন। পিতা কলিকাতায় বাড়াবাড়া করিয়া তাঁহাকে রাখিয়াছেন,— পিতৃপ্রিয় ভৃত্য রামচন্দ্র পল্লিগ্রামের দাকাটা ভাষাহর কঠিনতম প্রেমশৃঙ্খল বিছিন্ন করিয়া অগত্যা কলিকাতা সহরের চত্বর জীব হইতে স্বীকৃত হইয়া ললিতের গারজিয়নতা করিতেছেন। ষ্ট্রার্টের নতন গাড়ী ওয়েলার সংযুক্ত হইয়া সময় সময় রামাকেও টানিতেছে। ললিত প্রেসিডেন্সিতে পড়িতেছেন। তিনি প্রেসিডেন্সির একজন ভাল ছেলে। এলেতে বৃত্তি পাইয়াছেন,—বি, এ, তেও খুব ভাল হইয়া পাস হইবার আশা করেন।

এরূপ বড় লোকের সহিত গরীব মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে বতীনের কিরূপে এরূপ বন্ধুত্ব ঘটিল? এক দিন বতীন কলেজ হইতে ফিরিতেছিলেন,—দেখিলেন, একখানা ভাল ঘুরের গাড়ী উর্দ্ধবাসে ছুটিয়া আসিতেছে,—কোচমান সহিস নাই,—ঘোড়া উদ্ভ্রান্তের জায় ছুটিয়াছে। পথের লোক হই হই শব্দ করিয়া উদ্ভিত্তেছে,—আর দুই এক মিনিটের মধ্যে গাড়ী চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। বতীন দেখিলেন,—এক ব্যক্তি গাড়ীর ভিতর আছেন, তিনিও অনতিবিলম্বে গাড়ীর সহিত নিশ্চিষ্ট হইবেন। বতীন তৎক্ষণাৎ পার্শ্ব এক সহপাঠীর হস্তে পুস্তকগুলি দিয়া তীরবেগে সেই গাড়ী ধরিতে ছুটিলেন। পথের লোক কেহ উৎসাহ দিল, —কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, “কর কি,—যারা বাবে!” বতীনের

লক্ষী-লাভ

কর্ণে কাহারও কোন কথা প্রবেশ করিল না,—তিনি ছুটিয়া গিয়া উন্নত মহা তেজস্বী অশ্বের মুখস্থিত লাগাম ধরিলেন। অশ্ব তাঁহাকে প্রায় শত হস্ত টানিয়া লইয়া গেল, কিন্তু তবুও তিনি ছাড়িলেন না; অশ্ব দাঁড়াইল। তখন আরও দশ বিশ জনে আসিয়া ঘোঁড়া ধরিল।

ভিতরে ছিলেন ললিতপ্রকাশবাবু। তিনি গাড়ী হইতে নামিলেন। কেহ কেহ বলিল,—“মশায়, আপনি কি ক’রে গাড়ীর ভিতর নিশ্চিন্ত হয়ে ব’সেছিলেন।” ললিতবাবু যত্ন হস্ত করিলেন,—কোন উত্তর দিলেন না। তিনি আসিয়া বতীনকে সেকহাত করিলেন,—অশ্বের লাগাম লইলেন,—অশ্বকে, সম্মুখে চপেটাঘাত আদর করিলেন; অশ্ব আপন প্রভু চিনিল, হেঁচা বব করিয়া উঠিল। তখন ললিতবাবু বতীনকে গাড়ীতে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। বতীন অস্বীকৃত হইলে তিনি এমনই যত্নরূপে তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন যে, বতীন আর না বলিতে পারিলেন না; গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন! ললিত কোচবারো উঠিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিলেন। সেই পর্যন্ত বন্ধুৎ!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিশিবার

ভুক্তিত স্পন্দিত বতীন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বহুক্ষণ একদৃষ্টে সেই বেগবান দূরাগম্যরক গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। গাড়ী দূর হইতে দূরে গিয়া ক্রমে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। তখন তিনি চারিদিকে চাহিলেন—পথে জনমানব নাই। প্রথমে জদয়স্পন্দক বিবাহসংবাদ,—তৎপরে প্রিয় বন্ধুর পিতার শঙ্কোৎপাদক কঠিন ব্যাধিসংবাদ,—পরের অজ-প্রত্যজ-বিবোচন অপবাত যত্ন,— তৎপরে এ কাহার আবার সমূহ বিপদ। কে গাড়ী হইতে বিপদে এদ্রুপ কাতরে তাঁহাকে ডাকিল! প্রথমে তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই;—এক্ষণে কথকিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া, ধীরে ধীরে বুঝিলেন,—স্বর আর কাহারও নহে, তাঁহারই ভ্রাতৃজায়া লালিত্য-ময়ী ললিতার ভ্রাতা অতুলবাবুর। আহা! পীড়িতা স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননী ব্যতীত অতুলের যে আর সংসারে কেহই নাই! তিনি যে ধোরতর কঠিন পরিশ্রম করিয়া সামান্তমাত্র উপার্জনে জননীর সেবা করিতেছেন! সেই পীড়িতা শয্যাগতা বৃদ্ধা, পুলিশপ্রহরী-পরিবেষ্টিত পুত্র হইতে ছিন্ন হইয়া, কিরূপ ব্যাকুল কাতরতায় হুই চক্ষের জলে ভাসিতেছেন,—এ দৃশ্য যুহুর্ন্তের অন্ত বতীনের চক্ষের উপর ভাসিল! যখন তাঁহার বড় আদরের স্নেহের বউদিকি

লক্ষ্মীলাভ

নবনীসমা কোমলা ললিতা তাঁহার একমাত্র ভ্রাতার এ ঘোর বিপদের কথা শুনিবেন, তখন তাঁহার সেই বিশাল চক্ষুদ্বয় কিরূপ গভীর বিষাদে জলে ভাসিয়া যাইবে,—সে দৃশ্যও নুহুর্ন্তের জন্ম যেন তিনি চক্ষের উপর দেখিলেন ! বতীন পার্শ্বের গ্যাসস্তম্ভে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন ।

নীরব নিশীথিনীর সুশীতল সমীরণ তাঁহাকে ধীরে ধীরে বাজন করিয়া তাঁহার উষ্ণ ও উত্তপ্ত শোণিত কথঞ্চিৎ শীতল করিল। দূরে অর্ধমুগ্ধ পাহারাওয়ালার স্বপ্নে নিকটে ইন্স্পেক্টর-মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল ; সেই শব্দে কুহুরকুল তারতরে ডাকিল। বতীনের চমক ভাঙ্গিল,—তিনি চিন্তিতমনে বিবাদজ্বদয়ে সত্বরপদে “মেসের” দিকে চলিলেন ।

দ্বার রুদ্ধ,—মেসবাসিগণ সুপ্ত। বতীন দ্বারের দাক্তা দিলেন,—কড়া নাড়িলেন,—হুই একজনের নাম করিয়া ডাকিলেন। তাঁহার দ্বর সেই ঘোর নিস্তব্ধতাপূর্ণ রাত্রে তাঁহার কর্ণে ঘোর বিকট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বেশী চীৎকার করিয়া ডাকিতে তাঁহার সাহস হইল না ; তিনি হতাশ হইলেন,—কেহ দ্বার খুলিয়া দিল না। পাঠে পরিশ্রান্ত ছাত্রবৃন্দের কর্ণকুহরে তাঁহার কাতরস্বর ঐবেশ করিল না। তিনি অনন্তোপায় হইয়া দ্বারপার্শ্বস্থ রোওয়ারকে বসিয়া পড়িলেন ; অধিকক্ষণ দাঁড়াইবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না।

কোন দিকে কেহই নাই। লক্ষ্যকণ্ঠে আলোড়িত কলিকাতা

নিশিবাবু

সহর যেন অতল সাগরগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। কেবল দূরে দূরে গ্যাসগুলি মস্তক উত্তোলিত করিয়া তাহাদের অনল-মুহূর্ত হেলাইয়া দোলাইয়া প্রকৃতির সজীবতা প্রতীয়মান করিতেছে। সহসা বতীন চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিশিধিনীর সেই ভীতিসঞ্চারক নিস্তব্ধতা তেদ করিয়া কাহার জুতার মস্ মস্ শব্দ পাদুকার নব জীবন জ্ঞাপন করিয়া চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে শিস্—স্তরে স্তরে, হিল্লোলে হিল্লোলে—দুরন্ত স্রমধুর বংশীবাদনের জ্বার উখিত হইতে লাগিল। ক্রমে সেই পাদুকা ও শিসের স্বস্বাধিকারী বতীনের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন বতীন আশ্রিত হৃদয়ে দেখিলেন,—নিশিবাবু! তিনি বলিলেন, “এই ফিল্মে নাকি?”

বতীন বলিলেন, “না,—অনেকক্ষণ এসেছি; দরজা খোলা পাইনি।”

“ওকি তোমার কাজ!” এই বলিয়া নিশিবাবু ঘরস্থ দুই লৌহকডা দুই হস্তে ধরিলেন। উচ্চ হইতে উচ্চতর,—উচ্চতম শব্দে সেই কড়ারোল উঠিল,—আশে পাশের বাটীর গবাক্ষসকল উন্মুক্ত হইয়া মলুম্বাছায়া রাজপথে পড়িল;—নানাপ্রকার স্পষ্ট অস্পষ্ট সূত্রাব্য কুস্রাব্য বাক্যাবলী স্রুত হইল। ছাত্রগণের প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়া যেসের কেহ কেহ ধড়ফড় করিয়া লক্ষ পুরঃসর শয্যা হইতে উঠিলেন; চীৎকার করিয়া বলিলেন, “বাই,—দাঁড়াও, বাচ্ছি!”

লক্ষী-লাভ

নিশিবাবু ধামিলেন ; বলিলেন,—“দেখলে !”

উভয়ে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বতীন বলিলেন,—“নিশি, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা কথা আছে।”

নিশিবাবু দাঁড়াইলেন ;—চক্ষু আকর্ণবিস্ফারিত করিয়া বতীনের দিকে চাহিলেন ;—সবলে তাঁহার পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ সাদর চপেটাঘাতান্তর সেই বিস্ফারিত চক্ষু অভূতপূর্ব ভাবে ঘুরাইয়া বলিলেন,—“বুকেছি। আমার মত—মর্শাস্তিক মত—বে পেলেনই কর্কে—সুভদ্রা শীঘ্রম্।”

বতীন বলিলেন,—“না,—অন্ত বিশেষ কথা আছে।”

“তবে কাল।” এই বলিয়া তিন লক্ষ লক্ষ নিশিবাবু উপরে উঠিয়া শস্যার অভ্যন্তরে নিযুক্তিত হইয়া গেলেন। তখন তথা হইতে শিল্পর ভীতিপ্রদ অনিদ্ৰিতের শব্দটদায়ক নাসিকা গর্জন শ্রুত হইতে লাগিল। বিষয় চিন্তে বতীন নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। কেরোসিন ল্যাম্পটি স্থিমিত ভাবে তাঁহার টেবিলের উপর জ্বলিতেছিল, তাহা প্রজ্বলতর করিলেন।

তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠকে একপানি পত্র লিখিতে বসিলেন। ললিতের পিতার পীড়ার কথা ও অতুলের বিগদের কথা সকল লিখিয়া, তাঁহার বিবাহ উপস্থিত স্থগিত রাখিতে অহরোধ করিলেন। পরে লিখিলেন যে, তিনি বেক্সে হয় অতুলকে খালাস করিয়া ললিতের পিতার সংবাদ লইয়া বখাসজব শীঘ্র

নিশিবার

পিতার চরণ দর্শন করিবেন। তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া
যতীন শয়ন করিলেন। সৰ্ব্বশাস্তিপ্রদায়িনী নিজাদেবী ধীরে
ধীরে আসিয়া তাঁহাকে বিরামালয়ে লইয়া গেল।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুলিশ আফিস

এ অবস্থায় নিশিবাবুর সহায়তা অবলম্বনই একমাত্র উপায়,—
যতীন রাতেই মনে মনে তাহা স্থির করিয়াছিলেন। ফৌজদারি
দণ্ডবিধির ভিত্তিস্বরূপ, ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের বল—ওয়ারেন্টরূপ নাগ-
পাশাত্রে অতুল আবহু ; জামিনই ইহার একমাত্র প্রতিরোধক
গুরুদ্বার,—যতীন তাহা জানিতেন ;—সুতরাং অতুলকে পুলিশ-
পুঙ্খবের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে হইলে, প্রয়োজন একজন
ব্যবহারজীবী এবং একজন জামিনদার। নিশিবাবুর দ্বারা
উভয় কার্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে। তিনি জমিদারের ছেলে,
—জমিদার, বহু সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী। ললিতের মত
অত বড় লোক না হইলেও দরিদ্র বা গৃহস্থ নহেন,—সম্ভ্রান্ত
ঘনাচ। সংসারে তাঁহার থাকিবার মধ্যে আছেন, একমাত্র
৮পিতৃদেবের অশীতিবর্ষিণী পূজনীয়া জননী, সুতরাং তিনি
সর্বমতোভাবে তাঁহার অর্থাদি বা সম্পত্তি সশঙ্কে স্বাধীন। তবে
যে তিনি যেসবাসী, সে কেবল তাঁহার সখ। এতদ্ব্যতীত তিনি
পূর্ণ সুচল ব্যবহারজীবী না হইলেও, যখন প্রত্যহ নাম ডাকিবার

পুলিশ আকিস

অব্যবহিত পূর্বে, আইনশ্রেণীর সুবিজ্ঞ অধ্যাপককে নিয়মিতরূপে দিনের পর দিন স্বয়ং প্রদর্শন করাইতেছেন, তখন আজ হউক আর কাল হউক, একদিন অগতের বেশ-রাজ্যের সেই অভূতপূর্ব .সামলা-নামধের জীবকে মস্তকে ধারণ করিবার পূর্ণ আশা রাখেন ; সুতরাং নিশিবাবুর পক্ষে একজন বিজ্ঞ বা অবিজ্ঞ হবো-সমবাবসারী সংগ্রহ কোন মতেই কঠিন নহে। বিশেষতঃ বতীন জানিতেন, নিশিবাবু খামখেয়ালী হইলেও সূচত্বর,— একটু পাগলাটে হওয়া সত্ত্বেও স্মৃদ্ধিমান্। তাহার মন উদার, প্রশস্ত,—সর্বদা পরোপকারে ব্যগ্র,—তিনি কোন কার্যেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক নহেন। তাই প্রাতে উঠিয়াই, বতীন আত্মপূর্ব্বিক সমস্ত কথা নিশিবাবুর নিকট বিবৃত করিলেন। •

নিশিবাবু নীরবে শুনিলেন ; ইঙ্গিতে বতীনকে বেশ বিভ্রাস করিতে বলিয়া, নিজেও সজ্জিত হইলেন। পরে গৃহকোণস্থ ষ্টীলট্রাফের আবরণ কিঞ্চিৎ মাজ উখিত করিয়া তাহার গহ্বরে হস্তের অধিকাংশ প্রবিষ্ট করাইয়া কি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন ; পরে উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথে আসিয়া সহসা বতীনের দিকে ফিরিয়া নিশিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—“টাকা ?”

বতীন বলিলেন ;—“কিছু আছে।”

“কত ?”

“পাঁচ টাকা।”

লক্ষী-লাভ

নিশিবাবু শিশু দিলেন ; তৎপরে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন । তাঁহার হাসিতে চমকিত হইয়া রাজপথবাহিগণ আশ্চর্য্যাবিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল । অনেকেই ফুটপাথ ছাড়িয়া তাঁহার দিকে চাহিতে চাহিতে দূর দিয়া চলিয়া গেল । বতীনও অপ্রস্তুত হইলেন ; বলিলেন,—“কত দরকার ?”

নিশিবাবু নিজ দক্ষিণ হস্ত সবলে পকেট নামক স্থানে প্রধাতিত করিলেন ; তত্রস্থ সংসারের সেই পরম বস্ত সর্ব-শক্তিমান, সর্ববিপদহারী, মায়াময় রজতখণ্ডগুলি সম্বন্ধে যথুর নিকনে মিষ্ট নিনাদ করিয়া উঠিল । নিশিবাবু বলিলেন,—“ওনু! পকেট বোকাই চাই ! বোকাই চাই ! সে বড় কঠিন ঠাই. গুরু শিষ্যে দেখা নাই ।”

এই সময়ে অশ্ববংশীয় কঙ্কালযুগল ট্রামরূপ কেরানীবাহন পার্শ্ব দিয়া টানিয়া লইয়া যায় ! “বীধো বীধো” ধ্বনি ধ্বনিত ;—নিশিবাবু ও বতীন ট্রামখানে উৎখিত ; তৎপরে ক্রমে ধীরে ধীরে, কখন মন্থরগমনে, মধ্যে মধ্যে পূর্ণচ্ছেদে, লালবাজার পুলিশের দিকে নীত হইতে লাগিলেন ।

বেলা অষ্টার্দ্ধ । যে সকল হতভাগ্যগণের অদ্য জেলখানে বারু পরিবর্তনের পালা পড়িয়াছে, পাহারাওয়ালগণ সহ-জমাদার একে একে তাহাদিগকে বড় সাহেবের সম্মুখীন করণার্থে লাইন-ভুক্ত করিয়া দাঁড় করাইতেছে । মধ্যে মধ্যে চোর জেলে প্রেরিত না হইলে পুলিশের চাকরী রহে না ;—চুরি না করিলে চোরেরও

পুলিশ আফিস

অন্ন ছোটো না ; স্মরণীয় উভয়পক্ষের সুবিধার্থে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে চোরকুল পর্যায়ক্রমে ধ্বংসে যায়। আজ যে হতভাগ্যদের পালা পড়িয়াছে, কেবল তাহারাই আসিয়াছে ; তাহার চুরি করুক, আর নাই করুক, তাহাতে অধিক কিছু আসে যায় না।

নিশিবাবু ও যতীন পুলিশ আফিসে প্রবিষ্ট হইতে উদ্যত হইলে, জনৈক লালপাগড়ীর দীর্ঘ হস্ত তাঁহাদের গতি রোধ করিল। অনেক তর্ক বিতর্ক,—একপক্ষে নাতিমিষ্ট নাতি রুক্ষ,—অন্য পক্ষে রুচ ও অশ্রাব্য বাক্য,—এইরূপ বাকবিতণ্ডা,—পরে নিশিবাবুর হস্ত এক সিঁকি সহ পাহারাওয়ালাপুত্রবের হস্তে সম্মিলিত হইলে, সেই তত্ত্বরাজ্যের বহির্ভূত অধিতীয় মন্ত্র বলে তৎক্ষণাৎ দ্বার উন্মুক্ত হইল,—পথ পরিষ্কৃত হইল,—নিশিবাবু ও যতীন আফিসে প্রবিষ্ট হইলেন।

কে বলে ইহারাই সেই অন্নাদার-সাহেবলাহিত-কন্ডানারে-প্রপীড়িত কেদারীকুল ! গান্ধীযোয় পূর্ণাবতার,—ক্রুটিকৃষ্ণিত,—ভীতিসঞ্চারক,—নিশিবাবুর কাভর দরবারে ধোরতর বধির ! কাঠ ব্যবধানের পার্শ্বে ঝাড়াইয়া নিশিবাবু পুনঃ পুনঃ নিজ কাভরতা জ্ঞাপন করিবার প্রয়াস পাইলেন ; অবশেষে সেই কেরানীতৈরব রোষকবারিতলোচনে নিশিবাবুকে ভষ্মকরণাভি-প্রায়ে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কঠোর স্বরে কহিলেন, “তুমি তো ভারি গাধা হে ! সরকারী কাজের ব্যাঘাত কর। আমরা কি তোমার গোলাবাড়ীর চাকর !”

লক্ষী-গাভ

নিশিবার বৃদ্ধহস্ত ওষ্ঠান্তরাগে লুকাইত করিয়া বলিলেন,—
“না, তা নয়। আমাদের একটি বন্ধুকে ওয়ারেন্টে ধরে এনেছে।
দেখুন না, অত্যাচার করে এই কাগজ খানা।” কাগজ মধ্যে
লুকাইত দুইটা রক্তত মুদ্রা!

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ গরুছিনাই



“কি আশ্চর্য! মহাশয় কিছু মনে করেন না। অনেকক্ষণ আপনাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। আমি নিজেই আপনাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের কাছে নিয়ে বাচ্ছি।” এই বলিয়া সেই কেরানীপ্রবর সদর কাষ্টাসন ত্যাগ করিলেন। সর্বশক্তিমান মহারানীর আননাক্ষিত রক্তধণ্ডকে নমস্কার!

“মশায়, এখানে গাধার খাটুনি। এখানে ভদ্র লোকের মেজাজ ঠিক থাকে না। আপনারা মনে করেন যে, আমরা বড় রক্ত,—তা নয়,” ইত্যাদি, ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি নিশিবাবু ও বতীনকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের আকিসে লইয়া আসিলেন,—সাহেব ক্রকুটি করিয়া মস্তক তুলিলেন।

সাহেবের পার্শ্বে দণ্ডারমান একটা বন্ধীর পুলিশের বেশে ইন্সপেক্টর। তিনি নিশিবাবুকে দেখিয়া সমস্তমুখে নিকটে আসিয়া বলিলেন,—“আপনি এখানে কেন?”

নিশিবাবু বলিলেন, “একটা বন্ধুকে ওয়ারেন্টে ধরে এনেছে।”

“তার নাম কি?”

“অতুলচন্দ্র রায়।”

“হাঁ। সে তো আমারই কেস্। জ্ঞাপনি কি জামিন হবেন?”

লক্ষ্মী-লাভ

তিনি সাহেবের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“আমার কেসের আসাবীর ইনি জামিন হবেন। একে আমি খুব ভাল চিনি,— ইনি ধনী ও জমিদার।”

সাহেব একটা পেন মুখে করিয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া ক্রুটিকৃষিত নয়নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকদ্বয়কে পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে সেটিকে ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া বলিলেন, “ভাল ;—আড়াইটার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির হইবেন।”

সব ইনস্পেক্টর বাবু বলিলেন, “বাহিরে একটু দাঁড়ান ; আমি বাইতেছি।”

নিশিবাবু ও বতীন মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া সাহেবকে সেলাম দিয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠ সম্মুখস্থ বারান্দায় আসিলেন।

“মশায়, বাবার সময় দেখা করে যাবেন,” বলিয়া কেরানী-গুরদর স্বকর্তাসনান্ভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

সব ইনস্পেক্টরটী এক সময়ে বাল্যকালে নিশিবাবুর সহানু-ধ্যায়ী ছিলেন। কেবল ইহাই নহে ;—নিশিবাবু তাঁহাদের জমিদার। এরূপ শুভ সংঘটনে বতীনের প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল,—কার্য্য এখন সহজে মিটিবে ভাবিয়া নিশিবাবুও কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। একটু পরেই সব ইনস্পেক্টর বাবু পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

“কেস কিছুই নহে ; জামিন ৫০০ টাকার মাত্র ; চার্জ পক-

গরুছিনাই

হিনাই। গ্রামের লোক শত্রুতা করিয়া এ মিথ্যা মোকদ্দমা আনিয়াছে, ভয়ের কোন কারণ নাই। এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন লইয়া ছাড়িয়া দিবেন; পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হইতে হইবে। মোকদ্দমার প্রায় একমাস বিলম্ব আছে।” সব ইনস্পেক্টর বাবু এই সকল জ্ঞাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “একবার কি এখন তাঁর সঙ্গে দেখা কর্বেন?”

বতীন নিশি বাবুর দিকে চাহিলেন; নিশিবাবু বলিলেন, “না,—একেবারে সেই সময় দেখা করা যাবে। একটা উকিস দরকার কি?”

সব-ইনস্পেক্টর বাবু বলিলেন, “কোন দরকার নাই। তবে ইচ্ছা করেন, কাকেও রাখে ন।”

নিশিবাবু ও বতীন পুলিশ আফিস নায়ক আতঙ্কউৎপাদক স্থান হইতে নিজ্জামত হইতে উদ্যত হইলে, তাঁহাদের পরিচিত কেরানীবন্ধু কাঠব্যবস্থান অন্তরালে সন্ধান উদ্ভূত করিয়া বলিলেন, “যশায়, নমস্কার!”

নিশিবাবু সে দিকে কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাত করিলেন না, বতীনকে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে একটি নির্ধম চিম্টি প্রদান পুরস্কার বলিলেন, “উহু!”

উভয়ে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লালবাজারস্থ শুল্ক গিৰ্জা-চূড়ায় ঘড়ীটা নীরবে চারিদিকে বেলা সাড়ে নয়টা জ্ঞাপন করিতেছে। কেরানীকুল উৰ্দ্ধ্বাঙ্গে আফিসাঞ্চলে ছুটিয়াছেন।

লক্ষ্মী-লাভ

ভাগ্যবানগণ লইয়া শত শত শকটাবলী ইতস্ততঃ বাবিত
হইতেছে। বেকার দুর্ভাগ্যগণ হতাশহৃদয়ে ছত্রবগলে চাকুরী
-অন্বেষণে চলিয়াছে। চারিদিকেই ছুটাছুটি ছটাছটি! সকলেই
ব্যগ্র ও ব্যাকুল!

ষষ্ঠী বলিলেন,—“এখন কি কর্কে?”

নিশিবাবু গম্ভীরে বলিলেন,—“উকীল!”

ষষ্ঠী বলিলেন,—“উনি বলেন উকিলের প্রয়োজন নেই।”

নিশিবাবু শিস্ দিলেন, তৎপরে বলিলেন, “পুলিশকে যে
বিশ্বাস করে সে বর্কর!”

ষষ্ঠী বাবু কোন কথা কহিলেন না, নিশিবাবুর অমুসরণ
করিলেন; তিনি সেই সুবিখ্যাত ঘুঘুপরিবেষ্টিত নানা রংবেরংয়ের
“বাবু” সমাকীর্ণ “উকীল পাড়ার” দিকে নিজ পদযুগল বিক্শিপ্ত
করিতেছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উকিলপাড়া

ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ট্রিটের আহেলামামলার দ্বিপ্ত উৎকৃষ্ট ও ওতপ্রোত “উকিলপাড়ার” একটা সুবহৎ অট্টালিকার নিম্নতলস্থ একটি অন্ধকারায়ত গৃহে বক্তৃতা বাবুর অফিস। গৃহটা সময়-কালপাত্রাদ্বারা পূর্ণানুপূর্ণ পাকশালা, বানশালা, গোশালা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিয়া এক্ষণে উকিলশালার পরিণত হইয়াছে। গৃহের মধ্যস্থলে একখানি টেবিল,—শতচ্ছিন্ন, সহস্র মসিযুক্ত অয়েলরুপখানি ধূলায় ধূসরিত হইয়া তাহার উপর গড়াইতেছে। এই লজ্জানিবারণীকে তুলিয়া দেখিলে দেখা যায়, টেলিলের একটা পায়রা নাই, ইটকরাশি তদকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছে। কোণভাঙ্গা মসিপাত্র দুই একটা থায়া পেন ও ভয় নিব ষ্টীপপেন সহ টেবিলের এক পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে। ধূলায় মণ্ডিত কয়েকটা কাগজের বাণ্ডিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। তাহাদের কটিবন্ধস্থ লাল কিতাগুলি কালপ্রভাবে শেতমুণ্ডি ধরিয়াছে।

ভয়-প্রবণ টেবিলের পার্শ্বে শুধৈবচ চেয়ারত্রয়। উহার পশ্চাতে বহুবাক্যরহ পুরাতনদ্রব্য বিক্রেতা হইতে ক্রীত এক প্রাচীনতম পর্দা। ইহারই পশ্চাদ্দেশে বক্তৃতা বাবুর “কেবল ৭/-

লক্ষ্মী-লাভ

খানা।” পর্দার অন্তরালে কেরাণীকুলের পরিবর্তে ছিল—একটি দুর্গন্ধময় আবর্জ্ঞনাপূর্ণ নর্দমা।

বহু কেরাণী পরিপোষণে বক্কেশ্বরবাবু ভগবান হইতে বঞ্চিত। তবে ছিল না, এরূপ নহে। লম্বে সাড়ে পাঁচ হাত, দীর্ঘে অশ্লুপাত, জ্যামিতির সরল রেখার লীবন্তু মূর্তি ভজহরিবাবু তাঁহার “বাবুর” কার্য্য, “কেরাণীর” কার্য্য, “পিয়নের” কার্য্য, “দারবানের” কার্য্য, তাঁহার আফিসের “সর্ব্বকার্য্য,” অধিকন্তু তাঁহার “টাউটার” বা দালালের কার্য্য,—একাধারে সমস্তই সুসম্পাদন করিতেন। কাজেই ভজহরিবাবু বক্কেশ্বরবাবুর দক্ষিণহস্ত,—তাঁহার বল ভরসা আশা। তবুও বক্কেশ্বরবাবুর চিন্তার বিরাম নাই। পুনঃ পুনঃ ফেল হইয়াও, নিজ অত্যাশ্চর্য্য ও অনৈসর্গিক অধ্যাবসায়বলে, বক্কেশ্বরবাবু তৃতীয় ডিভিসনে পাশ হইতে হইতে স্তরে স্তরে ক্রমে বিদ্যা-মইয়ের বি, এল, রূপ দণ্ডে আরোহণ করিলেন। তথা হইতে দুই মফস্বলে, বটবুজ-তলে, মকর্দমা ও তদনুসঙ্গিক অর্থের অশ্লুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। আদালতের সল্লিকটে কুটির বাঁধিয়া, অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে আহেলামাসমসার কঠিন সাধনায় নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার অতুলনীয় অধ্যাবসায়ের সরস্বতীদেবী সাহসকূলা হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী মুগ্ধা হইলেন না। এইরূপে সাতবৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।

তখন,—“আমাকে ইহারা চিনিলা না, বুঝিলা না। মফস্বলের

মুখ হাকিম এবং ষোড়শতর মুখ আহেলাবাবলা আমার অসীম ক্ষমতার কি বৃদ্ধিবে! হাইকোর্টে গেলে নিশ্চয়ই গুণের আদর হইবে,—তবিত্তে জজ হইবার সম্ভাবনা আমারই আছে।” জুজ্জ্বিলীর নিকট এবিধ বক্তৃতা করিয়া বকেধরবাবু তাঁহার অলকারগুলি হস্তগতান্তর পাঁচশত টাকা সংগ্রহ পূর্বক, উকিল নামে পদস্পর্শ করিয়া উকিলরূপে পরিণত হইলেন। তবুও লম্বা মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।

এই সময়ে ভজহরির সহিত পরিচয়। “এটর্নি হইলে মকররবা মাঝা ছাড়া অন্য উপায়ে দুপয়সা আছে,”—ভজহরিরই এ গম্যাবধাতি। মহা অধ্যবসায়ী বকেধরবাবু তাই আজ এটর্নি;—ভজহরির তাই আজ তাঁহার “বাবু।” কিন্তু সেই অমরবাহিত পরমবত্ত রজতধণ কোথায়? দুঃপর্যাহত,—চাঞ্চল্যনীতি অবলম্বন করিয়া বকেধরবাবু হইতে শত হস্ত দূরে তিনি অবহিতি করিতেছেন।

নিশিবাবু বতীনগহ এই উকিলরূপী এটর্নির সম্মুখীন হইলেন। লক্ষ দিয়া বকেধরবাবু উঠিলেন,—তাবিরাহিলেন,—সমন! ছয়শাস বাকীভাড়া তাঁহার হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হয় নাই! কিন্তু নিশিবাবুকে দেখিয়া আশঙ্ক হইয়া তিনি বিবাদ হাসি হাসিয়া ধীরে ধীরে হস্ত আশ্রয়ান করিলেন। নিশিবাবু উহা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “ইনি আমার বিশেষ বন্ধু, বতীনবাবু। জোয়ার কাছে আমাদের একটা কাজ আছে।”

লক্ষী-লাভ

নিশিবাবু 'ধনাঢ্য'—বাগ্যবহু ; ইহার দ্বারা বহু উপকার সম্ভাবনা। বকেশ্বরবাবু বলিলেন, “তোমরাই আমাদের মনে কর না।”

নিশিবাবু বলিলেন,—“এইতো করিলাম। এখন কাজটা শোন। কাজ হচ্ছে এই,—আমাদের একটি বন্ধুকে ওয়ারেণ্টে ধরে এনেছে,—আমি তাঁর জামিন হব। আমরা সে সব বন্দোবস্ত করে এসেছি। তোমাকে কেবল একবার ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হতে হবে। তা তোমার পরিশ্রম মুক্তে কর্তে হবে না,—আমরা কি দিব।”

বকেশ্বরবাবু আকর্ণ হাসিয়া কেলিলেন ; বলিলেন,—“তোমরা না সহায়তা কল্পে কে কর্কে।” এই বলিয়া বকেশ্বরবাবু শব্দ উঠিলেন ; হস্ত প্রসারণ করিয়া পেরেকে বিলম্বিত, পিতৃপুরুষ-হইতে-প্রাপ্ত, কালপ্রকোপে বিবর্ণ ও ছিন্ন, সাংলাটা গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু তৎপর মুহূর্তেই থক্ থাইয়া বলিলেন,—“একটু দেরি কর্তে হবে। আমার হেডক্লার্ক বেরিয়ে গেছেন ; একটু বসো।” পরে বতীনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“বসুন।”

বতীন বলিতে উদ্যত হইলে, নিশিবাবু কীপ্রহস্তে তাঁহার পাঞ্জাবরণ ধরিয়া সবলে টানিয়া বলিলেন,—“উঁহু !”

বিলম্বিত হইয়া বতীন তাঁহার দিকে চাহিলেন। নিশিবাবু ভক্ষণে বলিলেন,—“দু দশটা নয়,—সাত—সাত। রক্ত বেশী থাকে বসো।”

উকিলপাড়া

বকেশ্বরবাবু হাসিয়া বলিলেন,—“হী,—চেয়ারগুলোর একটু
ছারের অত্যাচার আছে বটে।”

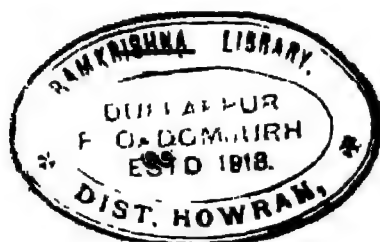
নিশিবাবু বলিলেন,—“তাতে এটারির বাড়ীর ছারপোকা—
•মাছঘের রক্ত পেলে চুষে খায়।”

বকেশ্বর বাবু বিষাদ হাসি হাসিলেন ! তাঁহার পক্ষে দুর্নামই
সার,—তিনি রক্তের “র” ও দেখিতেছেন না !

এই সময়ে ঘর মধ্যদিয়া এক দ্বিরা-লাহিত, সারস-
বিনন্দিত গলা ধৃষ্টভূত হইল। ঐ গলাস্থোভিত ক্ষুদ্র বস্তুক,
একবার নিশিবাবুর দিকে, একবার যতীনের দিকে, সম্মিত বদনে
চাহিল। অবনত-হইয়া, বকেশ্বরবাবুর দিকে কিরিয়া কর্ণ হইতে
কর্ণ পর্যন্ত বিস্ফারিত বদনে নীরব হস্ত করিয়া বলিল,
“ক্রায়েন্ট !”

বকেশ্বরবাবু তদনুরূপ হস্তে প্রহৃত্তর দিয়া নিশিবাবুকে
বলিলেন,—“আমার হেডক্লার্ক ;—ভজহরি বাবু।”

“হাথেল সারভেণ্ট,” বলিয়া ভজহরি বংশসম্মত স্বীয় দীর্ঘ বাহ
নিশিবাবুর দিকে প্রসারণ করিলেন ;—নিশিবাবু ঐ বতীম
উত্তরেই উহা বিলোড়ন করিতে বাধ্য হইলেন।



অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিচারালয়

দশকুহুরে—ঘটায় বারোআনাগ্রাহী,—সেকেওক্লাসের গর্ভে
লীন হইয়া নিশিবাবু, বতীন ও বক্তব্যবাবু ক্রমে কারাগার
বিলাসমন্দিরের নাট্যমন্দির-স্বরূপ পুলিশকোর্ট-রূপ বিত্তীবিদ্যা-
মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। লোকে লোকারণ্য !

নিম্নে ভাষাকুণ্ডলা, পান-সোডাওয়াটার-লিমনেড আবালা-
বুছরজন-সিগারেট-সজ্জিত আসনে বসিয়া তাম্বাকের অপভ্রংশ-
স্পর্শিত কলিকায়, নির্দোষিত অগ্নি অজারকণা সাজাইয়া, প্রতি
টানে টানে এক একটা তাম্রগোলক আদায় করিতেছে।
সোপানশ্রেণীতে কেরানীরাপে, মুহুরিরাপে, দর্শকরাপে, নানারাপে,
টাইটারগণ মাংসাকাশিগণকে ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে উদ্গ্রীব
ভাবে, মুহুরে, আইনভয়ে-শশঙ্কিত অন্তরে আগন্তকের সহিত
কথা কহিতেছে। ভাল উকিল, দুখজোর উকিল, হুঁদে উকিল,
সভা উকিল,—হাকিমের ডানহাত উকিল, নানাভাবে নানা
উকিল, বাহার বৈরুগ প্রয়োজন,—সকলই তাহার সংগ্রহ করিয়া
দিতে পারে !

উপরে বারান্দার জুবার্ণ, অতুল, তরোৎসাহ, গ্রাম্য “ভুলোর”
জার উকিলকুল ইভজতঃ বিচরণ করিতেছেন। আগন্তক দেখিয়া

উদ্বীণ নরনে, স্পষ্টিত হৃদয়ে, তাহার দিকে চাহিতেছেন।
কেহ কেহ অভাগ্য বর্কাকারীকে দ্রুত করিয়া টানাটানি
করিতেছেন,—কেহ কেহ বা তাহাদের চৌক পরীক্ষা করিতে
নিবৃত্ত আছেন। “বনবাস্তুর ডাক হইয়াছে ;” বলিয়া কেহ কেহ
আবার নিকি কিতেই পরিভ্রষ্ট হইয়া, ক্লান্তিকে টানিয়া লইয়া
হাকিমের দিকে পরিণামমান হইতেছেন। পাহারাওয়ালগণ
“চোপ্, চোপ্,” শব্দ করিয়া চারিদিকে আতঙ্ক উৎপাদন
করিতেছে। সেই নানা জাতীয় জনসমারোহের মধ্যে উকিল-
গণের সামলা,—পাহারাওয়ালগণের লাল পাগড়ীর সহিত
মিশ্রিত হইয়া, অপভ্রমণ শোভা ধারণ করিয়াছে।

আড়াইটার সময় সব ইন্স্পেক্টরবাবু আসিয়া নিশিবাবুর
পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন,—“শ্রীত আশ্রম।”

নিশিবাবু তাঁহার পশ্চাতে ছুটিলেন ;—সবে সবে বকেবরবাবু
ও বতীনও বাবিত হইলেন ; কিন্তু পাহারাওয়ালগণ পথরোধ
করিল। শেষে বহু শ্রাঘ্য অশ্রাঘ্য ভর্ক-বিতর্কের পর বকেবরবাবুকে
উকিল আনিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। বকেবরবাবু ভিতরে গিয়া
হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—“বেটার কথা আনি বিজ
ওয়ারসিপের কাছে এখনই বেন্‌সন করো। বেটা এখনই ডিসমিস
হয়ে যাবে।”

কিন্তু তাঁহার কথা বতীনের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না ;
তিনি বেধিলেন, বেটমুণ্ডে, সজল নয়নে, অতুল আসিয়া

লক্ষী-সাত

কাটপড়ার দাঁড়াইয়াছে। একবার তিনি ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিলেন,—কোনদিকে কোন পরিচিত মুখ দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার নয়ন জলে পূর্ণ হইয়া আসিল! তিনি নিশিবাবুকে চিনিতেন না; ভিড়ে বতীনকে দেখিতে পাইলেন না। বতীন ব্যগ্রভাবে বকেষরবাবুকে বলিলেন,—“বান,—শীঘ্র বান, দেখছেন না মকর্দমা উঠেছে।”

বকেষরবাবু ভিড় তেলিয়া অতি কষ্টে চেয়ার প্রেশীর মধ্য দিয়া অনেকের পদে পদস্থাপনে বাপান্তরিত হইয়া, হাকিমের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার ব্যাকুলিত স্বরাস্ত্র বয়ান দেখিয়া, হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনার কি কিছু বলিবার আছে?”

বকেষরবাবুর কণ্ঠ হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত লাল হইয়া গেল; তাঁহার বস্তিকে অগ্নি ছুটিল; কণ্ঠরোধ হইল। তিনি মুহূ হস্তের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কাজ আসিল;—টেবিল পর্যন্ত মস্তক অবনত করিয়া হাকিমকে অভিবাদন করিলেন। চারিদিকে যে একটু একটু হাততালি উঠিল, তাহা তাঁহার কণ্ঠে পশিল না। হাকিম একটু মুহূ হস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি কাহার পক্ষে এ্যাপিয়ার হইতেছেন?”

বকেষরবাবু নিরুত্তর;—একবার আকাশের দিকে চাহিলেন;—পরে চারিদিকে চাহিলেন,—অবশেষে হাকিমের দিকে চাহিয়া বিকট সন্মিত বদনে আবার মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন

করিলেন। তখন বতীনবাবু তাঁহার পক্ষাৎ হইতে তাঁহার কর্ণরূহরে সবাশ্রম্বরে বলিলেন,—“বলুন না.—অতুলচন্দ্র দ্বার।” সে কথা হাকিমের কর্ণে গেল; বকেবরবাবুর কণ্ঠ হইতে শব্দ নির্গমনের পূর্বেই, হাকিম সম্ভবতঃ হতভাগ্য বকেবরের প্রতি করুণাবশতঃ বলিলেন, “তাঁহার জামিন হইয়া গিয়াছে; আপনি বাইতে পারেন।”

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বকেবরবাবু ভিড় চেলিয়া বাহিরের দিকে আসিতে লাগিলেন।

যে সময়ে বকেবরবাবু দ্বারদেশে পাহারাওয়ালার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা, আইনকানুন্যের তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন, সেই সময়ে অতুল পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব কর্তৃক হাকিমের সম্মুখে নীত হইলেন।। সব ইন্স্পেক্টরবাবু, নিশিবাবু জামিন হইবেন বলায়, তখনই সে হুকুম হইয়া গেল। যখন বতীন ও বকেবরবাবু ভিড়ে ওতপ্রোত হইতেছিলেন, সেই সময়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব নিশিবাবু ও অতুলবাবুকে লইয়া অস্ত্র গৃহে-প্রবিষ্ট হইয়া যে সকল কাগজ পত্র সহি করিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা সহি করাইয়া লইয়া তাঁহাদের ছাড়িয়া দিলেন। বাহিরে আসিয়া স্পন্দিতভাবে সমস্ত নয়নে অতুলবাবু বলিলেন,—“মহাশয়,—আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নাই; আপনি আমার যে উপকার করিলেন, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না।”

নিশিবাবুর ওষ্ঠের শেষ সিমাক্তে শিশু আসিয়া সহসা স্থগিত

লক্ষী-সাত

হইল ;—একদ্রুণ বর্ণনা-অসম্ভবনীয় শব্দ তাঁহার রুদ্ধকণ্ঠে ধ্বনিত হইল ; তিনি বলিলেন, “চেনা লোক আছে । দাবড়াইবেন না ।”

এই সবরে উৎকুল আননে বতীন আসিয়া অভুলবাবুর হাত ধরিলেন,—তিনি চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না !

সহসা নিশিবাবুর পৃষ্ঠদেশে মর্ন্তমানবিনিদ্রিত অহুনি স্প্রশোভিত এক ব্রিটিশ হস্ত সাধরে পতিত হইল । সেই ব্রিটিসের বস্ত্রগভীর আয়ত্রে নিশিবাবুর পৃষ্ঠদেশ পেনিতপ্রায় হওয়ার, তিনি লক্ষ দিয়া সেই দিকে কিরিলেন । সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “বাবু, আপনার উকিল বন্ধুটির সময়ে হাই-কোর্টের জজ হইবার সম্ভাবনা আছে !”

পার্শ্বে বকেষরবাবু ভণ্ডায়মান,—তিনি মুখব্যামনপুরংগের সহাত বদনে মস্তক সস্রম্বে অবনত করিয়া কহিলেন, “ইয়েস, স্যার ।”



নবম পরিচ্ছেদ

ষ্টেসন

নিশিবাবু বতীনের জীবনতরীর কাণ্ডারীরূপে পরিণত হইয়াছেন। অতুলবাবুকে তাঁহার ব্যাকুলা জননীর নিকট পৌছাইয়া বতীন নিশিবাবুসহ যেসাত্তিমুখে চলিলেন। এক্ষণে গৃহে পিতৃচরণ দর্শনে বাইতে হইবে ;—বিবাহে সম্মত হইতে হইবে ;—বিবাহ করিতে হইবে,—অনুভোপায়। পিতা বা কোষ্ঠ জাতার অঙ্গুরোধ বা আজ্ঞা অবহেলা করা অসম্ভব। বতীনের বিবাহে বিলম্বমাত্র ইচ্ছা নাই,—কখনও ছিল না। এতদ্ব্যতীত এক্ষণে তিনি কেন জানেন না, তাহার মনে হইতেছে যেন বিবাহ করিলে,—এ বিবাহ করিলে,—তাঁহার সমুহ অনিষ্টের সম্ভাবনা ! কিরূপে তিনি এ বিপদ হইতে রক্ষিত হইবেন ! কে তাঁহাকে এ ঘোর সমস্যাটো রক্ষা করে !

বতীন তাবিলেন, যদি কেহ তাঁহার বিবাহ স্থগিত রাখিতে পারে, তবে সে নিশিবাবু ! তিনি ব্যতীত আর কেহই এ অঙ্গুরোধ তাঁহার পিতাকে বা জাতাকে স্পষ্টতঃ করিতে পারিবেন না,—আর কেহই তাঁহাদিগের মতের পরিবর্তন সম্বন্ধে করিতেও সমর্থ হইবেন না। যদি কেহ পারেন, তবে সে নিশিবাবু। তবে

লক্ষী-লাভ

নিশিবাবু কি কলেজ কামাই করিয়া এত কষ্ট সহিয়া, তাঁহাদের দেশে বাইবেন ! . নানা ইতস্ততঃ করিয়া বতীন অবশেষে নিশিবাবুর নিকট নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন ।

নিশিবাবু কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া শিসে রাগিনী কিঁকিট ধাধাধা আলাপ করিতে লাগিলেন । বহুক্ষণ বতীন নীরবে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, “তবে কি হবে ?”

নিশিবাবু সহসা রাগিনী আলাপ বন্ধ করিয়া ভীতদৃষ্টিতে বতীনের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—বতীন অপ্রস্তুত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন । নিশিবাবু বলিলেন, “বে হচ্ছে না !”

“তবে বাবে ?” বলিয়া বতীন সোংশ্রুকে মস্তক তুলিলেন ।

নিশিবাবু বলিলেন, “বাব—এক কড়ারে ।”

বতীন বলিলেন, “কি ?”

নিশিবাবু বলিলেন, “ললিতবাবুর বাড়ী থেকে আর যেনে বাওয়া হবে না । হেঁটে বাব ; পথে কিছু এ্যাডভেনচর করা চাই ।”

বতীন যুহু হাস্য করিয়া বলিলেন, “তাই হবে ।”

সেই রাত্রেই গাড়ীতেই ললিতবাবুর বাড়ী বাওয়া স্থির হইল ; তথা হইতে পদব্রজে বতীনদের দেশে রওনা হইবেন ।

খার্ডক্লাসের ছাদ দুই ষ্টিলটাকে স্তম্ভোদ্ভিত করিয়া নিশিবাবু ও বতীন, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-বঙ্গের রথাকর দেয়ালদহ টেনশনালয়ের সীমান্তে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন । তৎপূর্বেই সন্ধ্যা সন্ধ্যা

ষ্টেন

দক্ষিণে বামে কয়েকজন নীলকুর্টা-হরিদ্রা-উকী-কুলী-নাথধের-স্বীকৃত হইতেছিল ; তাহারা এক্ষণে পূর্বোক্ত ট্রাকবরকে আক্রমণ করিল। বার্ডক্লাসের সারথীর সহিত চির প্রথানুযায়ী কিয়ৎকালের জন্য দড়-কচকচি-সহ, পারিশ্রমিক প্রদান কার্য শেষ করিয়া, সহকুলী নিশিবাবু ও বতীন টিকিট ছিন্নের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সিদ্দালদহ ষ্টেনের সুবিদ্যুত গৃহে হৈ হৈ শব্দ। ট্রাক, পেটরা, বাস, পৌটলা,—শত প্রকার জব্য সহস্র প্রকার ভাবে নীত হইয়াছে। চীনে, কারুলি, সিলেটা, চাটগেয়ে, বাঙ্গাল, মগ, বাবু, অবাবু, ভদ্র, অভদ্র, সাধু, অসাধু, চোর, গাঁটকাটা, অঞ্চল কোমরে বেষ্টিতা প্রথরা মুখরা, প্রৌঢ়া,—অবগুণ্ঠনবতী ব্রীড়াবনতা লজ্জাশীলা সরলা 'যুবতী ;—নৃত্যশীল বালক, ভীতা বালিকা,—মহাচৌক্যারী শিশু, একত্রে মিশিয়া অগ্নিবানের বিশাল উৎসবে প্রতিষ্ট হইবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। বার্ডক্লাসের টিকিটক্রয়-স্থানের কাঠ ব্যবধান দ্বার-ব্যুহে রেলওয়ে পুলিশ-রূপী দ্রোণ এক এক তাম্র-পোলক লইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিতেছে ;—লগ্নেকস্থানে বাবুর বদনের ক্রকুটি বিরক্তিতাব ক্রমে সিকি দুয়ানীদ্বারা তাঁহার পকেট পূর্ণ করিতেছে।

পৌটলা দ্বারাইল,—ভড়ের কলসী ভাঙিল,—ছেলে কোদার,—চাকরাণী ধুঁজিয়া পাওয়া যায় না ;—মোটী লোক ঘণ্টে বর্ধাস্ত,—মোপালোক ক্লাস্ত, পরিশ্রান্ত ;—এববিধ ভাবে কোন-

লক্ষী-সাত

রূপে সেই জনশ্রোত বানশ্রোণীর বেকিশ্রোণী পূর্ণ করিতে লাগিল।
“দেড়া মাওল, এ গাড়ী নয়,” হুই হানে এইরূপ শুনিয়া
নিশিবারু ও বতীন অবশেষে গাড়ীতে স্থানাবিকারে সমর্থ হইলেন।
কুলিরঙ্গী রেলওয়ের সর্বনাশকারিগণের সম্ভাব সাধন করণান্তর
নানা অযো পূর্ণ করিয়া সকলেই একা এক গাড়ী সূখে অধিকার
করিয়া ভোগদখলসুখ অক্লভব করিতে করিতে গমনে প্রয়াসী ;—
অন্তে যে ঠিক সেই মূল্য দিয়া সেইরূপ রেলওয়ে-গন্তব্যপত্রিকা
সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা কাহারও মনে একবারও উদিত হইতেছে
না ; হায় রে মানব-স্বার্থ !

ঢং—ঢং—ঢং,—ঘণ্টা বাজিল ;—কুর্কুরে শব্দে গার্ডের বাকী
নিমাদিল,—সেঁ। সেঁ। করিয়া ইন্ডিয়ান স্ট্রিম ছাড়িল ;—তৎপরে
সেই সহস্রবাহী ধীরে ধীরে সেরালদহ ষ্টেশন ছাড়িয়া নানাদেশ
দেশান্তরে চলিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

রেলপথ

লকা, পল্লু, কলাই, যুগ শোভিত ক্ষেত্রাবলীর মেঘলা-রূপে
সুউচ্চ রেল লাইন শোভা পাইতেছে। পার্শ্বে ক্ষুদ্র ষ্টেশন,
তৎপ্লাটকর্ম্মে উচ্চ বেত ও লোহিত হাতাবারী সিগনাল-বক
বহুদূর পর্য্যন্ত ষ্টেশনের ষ্টেশনর জ্ঞাপন করিতেছে। নিকটে
ইন্ডিন-জল-দায়ক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর নাতি শুষ্ক জলপার্শ্বে দীর্ঘ বক
একমনে চিন্তায় নিমগ্ন; সম্মুখেই ক্ষুদ্র ষ্টেশনের সর্ব্বকার্য্যকারী
ক্লক চাপকান ও ছিন্ন টুপীধারী বকবিনিমিত দীর্ঘ কুবাড় ষ্টেশন-
মাষ্টারবাবু টেলিগ্রাফের “টুক্-টুক্-টেরে-রে টুক্” শব্দ শ্রবণে অর্দ্ধ-
নিমিলিত নয়নে নিমুক্ত। পরে সেই রেলবীর বীরে বীরে উষ্টি-
লেন। বাহিরে আসিয়া সম্মুখস্থ লম্বমান রেলমণ্ডে নৌহনুও
সবলে আঘাতিত প্রঘাতিত করিলেন। টুং টুং শব্দ শুনিয়া
সম্মিষ্টবর্ত্তী মক্ষিকাচ্ছাদিত বহুকাল-নির্গ্মিত পকার, কেনি,
ঘোষোমণ্ডা স্মৃশোভিত বোকান হইতে ব্যাপ হস্তে মুক্তকাজ,
উভয়ীয়মান উভয়ীয়, পলায়ন পর-চটী-স্মৃশোভিত বেদান্তবাগীশ
মহাশয় পরিধাবমান হইলেন;—সঙ্গে সঙ্গে কোষরে বোগটি-
বন্ধে বটি, তৈল ময়ূষ গোবিন্দগওয়াল ছুটিয়া আসিল। শুড়-কুমড়া,
নারিকেল, মূলা পূর্ণ ধামা কন্ধে কতাপুর্বে-গমনপরায়ণা সুলকারা

লক্ষ্মী-লাভ

বান্দীবট হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিলেন। এদিকে তদপেক্ষাও হাঁপাইতে হাঁপাইতে কোঁপাইতে কোঁপাইতে ঘোর রোলে কলিকাতার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। শশব্যস্ত, স্বর্ণে স্বর্ণাক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে, তৈলাক্ত গোবিন্দগওয়ালাকে, ক্ষীতা বান্দী-বউকে টেন্সন মাষ্টার প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া রেল উদরে প্রবেশা-ধিকার দিয়া, হস্তস্থ পতকা উড্ডীয়মান করিতে করিতে লক্ষ্মান রেলদণ্ড বাজাইতে ছুটিলেন। ইত্যবসরে নিশিবাবু ও বতীন লক্ষ দিয়া প্লাটফর্মে অবতীর্ণ হইলেন। বংশী বাজাইয়া শোঁ শোঁ শব্দে গাড়ীও আবার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

টেন্সন হইতে একটি বাঁধা পাকা রাস্তা বরাবর সিঁদে চলিয়া গিয়াছে। অর্ধকোশ দূরে ঐ রাস্তায় প্রান্তভাগে এক বৃহৎ অট্টালিকার খেত প্রাচীর ও স্নুউচ্চ চিলে ঘর, বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য-দিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। রাস্তার দুই পার্শ্বেই শস্তপূর্ণ ক্ষেত্র, —বভদ্র দুটি যায় ক্ষেত্রের হরিজ্ঞা বসন মুদপবন হিল্লোলে, ছলিতেছে। কোথায়ও মধ্যে মধ্যে দুই একটি আম জাম কাঁটাল নষ্টক উন্মোচিত করিয়া ঘেন শস্ত-শ্রামলা ক্ষেত্রাবলীর পাহারায় নিযুক্ত আছে। পথের মধ্যে কোন কোন স্থলে দুই একটি গাভী বা ছাগী নিজ মনে ঘাস খাইতেছে, কোথায়ও শালিক, দয়েল বা ফিল্ড একস্থান হইতে উড়িয়া অন্ত্র বসিয়া লেজ নাচাইতেছে। নষ্টকে চাদর বাঁধিয়া প্রচণ্ড রোঁজে নিশিবাবু ও বতীন এই বাঁধা রাস্তা দিয়া ললিত প্রকাশ বাবুর বাটার দিকে চলিলেন। পশ্চাতে

রেলপথ

মুঠের যন্তকে তাঁহাদের ট্রাকবয় চলিল। পূর্বে সন্ধ্যা দিলে নিশ্চয়ই রামরাম চৌধুরীর বৃহৎ ফিটন ও জুড়ী তাঁহাদের প্রতীক্ষায় ট্রেনসন্ধ্যারে দণ্ডায়মান রহিত।

• অন্ধ পথে বৃহৎ সুদীর্ঘ, চির-সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গ গ্রাম্যপরিশোভন শেওলা-মণ্ডিত তালপুকুর; বহু বিস্তৃত দীঘি,—প্রায়, পরপার দেখা যায় না বলিলে অতুক্তি হয় না। সুউচ্চ পর্বত প্রমাণ পাড়ের উপর সারি সারি তালরাঙ্গি, স্ব স্ব মস্তক আকাশ পথে উন্মিত করিয়া, গগনগম্য ভাঁড়ে কোঁটায় কোঁটায় তাড়ি নামক দরিদ্র-হৃদয়-উৎফুল্লক কারণ রূপ সুরস দানে, ভাঁড়ের হৃদয় ষেত ফেনে পূর্ণ করিতেছে। দুই একটা চপল প্রকৃতি সুরঞ্জিত কাঁটবিড়ালী তালশাখে উঠিয়ায় প্রয়াস পাইতেছে। দূরে ভ্রামল শেওলাদামের উপর ষেত বক এক চক্ষু মুদিত করিয়া ক্ষুদ্র চাক চিকময়ী সফরীর প্রাণসংহাররূপ ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। পুকুরিণীর মধ্যস্থলে দুই একটা পানকোড়ি তাহাদের দীর্ঘ কৃষ্ণ গলা মণ্ডে মণ্ডে উন্মিত করিয়া, আবার নীল জলে নিমগ্ন হইয়া বাইতেছে। আশে পাশে দুই একটা মাক্কাতাবিধি কচ্ছপ জল হইতে তাহাদের বিকট মুখ কণিক কণিক তুলিয়া উঁকি মারিতেছে। পুকুরিণীর মধ্যস্থলে সময়ে সময়ে বড় কাতলা বড় বড় ঘাই মারিতেছে। দূরে রজকপ্রবর কঠমণ্ডের উপর হাস হাস শব্দে সবলে নির্মমভাবে হতভাগ্য হতভাগিণীগণের কাপড়ের সপিঙকরণে নিযুক্ত আছেন। বহু দূরে তাহাদের স্মল্লিত কঠবর প্রতি-

লক্ষী-সাত

স্বনিত হইতেছে। গ্রামের অর্ধঅবগুণ্ণনায়তা গওলাবউ কলসী ককে জল লইয়া তীরে উঠিতেছেন। তীরে বসিয়া বৃদ্ধ সার্কভৌম মহাশয় সম্মুখস্থ ছিপের ঈষৎ হিম্মোলিত কাতনায় এক চক্ষু রাখিয়া অপর চক্ষে গ্রাম্য ললনার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ক্রণী করিতেছেন না। নিশিবাবু এই সুদীর্ঘ দীঘির পাড়ে আগিয়া সহসা জমি লইলেন।

বতীন বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “আর দূর নাই,—ঐ বাড়ী দেখা যাচ্ছে।”

নিশি বাবু গভীর ভাবে বলিলেন, “অবগত আছি।”

“তবে চল,—আর দেরি করে কল কি?”

“উঁহু! আমাদের সমাধর কিরূপ হবে, অবগত না হয়ে, নিশি এখান থেকে একপাও অগ্রসর হছেন না! জুমি অগ্রসর হও,—আমি প্রকৃতির শোভা, আর ঐ লম্বা-টিকির মৎস্ত শিকার একটু পর্য্যবেক্ষণ করি।”

বতীন জানিতেন, নিশিবাবু একবার বাহা নিজ মস্তিষ্ক মধ্যে স্থির করিয়া লয়েন, তাহা হইতে, তাঁহাকে বিচলিত করা কাহারই সাধ্যাত্য নাই। বেশা প্রায় মধ্যাহ্ন,—চারিদিক রৌদ্রে ঝাঁঝ করিতেছে,—যাধা দিয়া আঙন ছুটিতেছে;—এ সময়ে নিশিবাবুর সহিত তর্কবিতর্ক,—বাকবিতণ্ডা,—কথা কাটাঁকাটি, করিয়া কোনই কল নাই। ললিতকে ডাকিয়া আনিলে, সকল গোলই মিটিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া বতীন বলিলেন, “আমি ললিতকে

ডাকিয়া আনিতেছি; তুমি এইখানেই তাহা হইলে অপেক্ষা কর।”

উত্তরে নিশিবাবু শিসে ইমনকল্লান ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভয়াবহ পক্ষ্মতানীয় শিসে ভীত ও চমকিত হইয়া সার্সভৌম মহাশয় বিম্বিত ভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন। —রজক তাহার হস হাস শব্দ নিমিষে বন্ধ করিল। বক চক্ষু মেলিয়া উড়িয়া গিয়া দূরে বসিল। দুই একটা দয়েল ডাক ছাড়িল। গওয়ালাবউ অবগুণ্ঠনাস্ত্রাল হইতে বহ্নিম নেত্রো নিশিবাবুর দিকে চাহিতে লাগিল। নিশিবাবু যে এই গ্রাম্যাশান্তিকুঞ্জে সহস্র এক অশান্তির আন্দোলন উদ্ভিত করিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিলেন;—তিনি বৃক্কতলে স্থলীতল ছায়ায় চোদ্ধ গওয়া হইয়া লম্বা হইলেন। •



একাদশ পরিচ্ছেদ

জমিদার-বাড়ী

নিশিবাবুকে ত্যাগ করিয়া বাইতে বতীনের আদৌ ইচ্ছা ছিল না,—কিন্তু নিরুপায় ; তিনি মুটে সহ দীর্ঘ পদে বহু সমাগমে চলিলেন। এ পর্য্যন্ত জীবনে আর কখনও তিনি বড় লোকের বাড়ী পদার্পণ করেন নাই ;—ললিতকে বাসায় দেখিয়াছেন,—জমিদারীতে দেখেন নাই,—তথায় তাঁহার কিরূপ আদর অভ্যর্থনা হইবে, তিনি তাহা জানিতেন না, প্রকৃতই তাঁহার হৃদয় একটু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, “নিশিবাবুকে একেবারে সঙ্গে না আনা ভালই হইয়াছে। ললিতের সঙ্গে দেখা হইলে, তখন আর তাঁহাদের কোন অবস্থা হইবে না!” স্মৃতি, সংসার-বিজ্ঞানে প্রাক্ত, জগতের-বিভিন্ন ভাবেপরিপক্ক, নিশিবাবু তাহাই পথে জমি লইয়াছিলেন,—সহজে তিনি হতাশব্রিত হইতে নারাজ !

সন্মুখে বৃহৎ অট্টালিকা ;—একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলে অত্যাক্তি হয় না। প্রাচীন আমলের বাড়ী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটে নিশ্চিত,—বহুদানেই তাহার। প্রাচীরে স্মৃতি দর্শাইয়া নিজেদের প্রাচীনত্বের পরীচয় দিতেছে। সাত মহল বাড়ী,—চারিদিকে একটা পরিখাও ছিল ; একপে এ পরিখা দুই তিনটা দীর্ঘ পুষ্করীতে

জমিদার-বাড়ী

পরিণত হইয়া বড় বড় রোহিত কাতলার পরিশোভমান হইয়াছে। পরিধা মধ্যস্থ শুক স্থানগুলি নব দুর্বাদলে হান্তময়ী ; কয়েকটা গাভী ও ছাগী অতি উপাদেয় ভেজবান দুর্বাদলে উদর পূৰ্ত্তি করিয়া রিতিমত নাহুশ লুহুশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সম্মুখস্থ কাছারি বাড়ীর গদিতে তথৈবচ একটি নাহুশ লুহুশ ভদ্রলোক, নানাবিধ রং বেরংয়ের লোক পরিবেষ্টিত হইয়া বার দিয়া বসিয়া আছেন। কাছারিতে জমিদারীর নানাবিধ কার্য চলিতেছে। বড় বড় তৈলমর্দিত সুনমন দীর্ঘ বংশবৃষ্টি স্বস্তে বাবরিওয়াল পাইকগণ স্থানে স্থানে বসিয়া প্রজাগণ সহ কিসকিস কথোপকথনে নিযুক্ত আছে। ষোড়াকি, বকসিস, সেলামি, রোজনামারূপে সিকি দুয়ানি হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইতেছে। আসগার মিঞা, কালু সর্দার, দুর্জ্জন মণ্ডল, রামবাহু সিকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত বহু প্রজা জমিদার বাড়ী দরবারে আসিয়া, মন্থন শৃঙ্গোল দেহ, আকর্ণ-গৌপ-সুশোভিত, দাওয়ান মহাশয়কে ষোধোচিত তৈল প্রদানে নিযুক্ত রহিয়াছে। কাছারি গৃহের বিভিন্ন তক্তপোষের মসিবিষণ্ডিত বহুকাল-রজকগৃহ-সন্দর্শনে-বাক্ত, স্থানে-স্থানে-তালিযুক্ত করায় উপরে, নানা বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন প্রাচীনকল্পণযুক্ত কাঠ হাত-বাক্সের সম্মুখে, দীর্ঘ, নাতিদীর্ঘ, স্থূল, নাতিস্থূল, তৈলময়ণ, তহশিলদার, খানাকি, মুহুরিগণ নানা খাতাপত্র লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন। কয়েকজন গলগর বজ্রে, জোড় হস্তে, তাঁহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া,

লক্ষ্মী-লাভ

ভাঁহাদের অল্পগ্রহ প্রার্থনায় ব্যাকুল নেত্রে ভাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। চৌধুরী মহাশয়ের বড়ই শাসন ;—প্রজাদিগের প্রতি ভাঁহার অসীম দয়া ;—তবুও ভাঁহার অসাক্ষাতে কৰ্ম্মচারী-পূজবগণ সুবিধামত স্বযুক্তি অবলম্বনে ক্রটি করেন না। দুই পয়সা এদিক ওদিক করিয়া ট্যাক নামক স্থানে নীত করিতে সৰ্কদাই প্রয়াস পাইয়া থাকেন। খাদ্য খাদকতা জগতের ধৰ্ম্ম ;—সে ধৰ্ম্ম নষ্ট করে কে ? চৌধুরী মহাশয়ের অসাধ্য।

পার্শ্ব বৈঠকখানা গৃহে সুপবিভূত দুধ্ধফেননিভ ফরাশ। উপরে ঘেরাটোপ-মণ্ডিত একটি ব্রহ্ম কাড বুলিতেছে ;—পার্শ্ব কয়েকটা বহু প্রাচীন আমলের বেগলঠন। প্রাচীরেও সেই আমলের কয়েকটা দ্যালগিরি,—সকলই বজ্রাবরণে অবগুষ্ঠিত। ফরাশ উপরে কয়েকটি রক্ত মণ্ডিত তামাকুসেবনবস্ত্র বৈটক নামক ভাঁহাদের চির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভাঁহাদের পদনিরে কয়েকটা আত্মপত্র বিনির্মিত নল গড়াইতেছে। গলগর কড়ি বায়ুতে হেলয়মান হইয়া, কয়েকটা বস্ত্রের ব্রাহ্মণাধিকার জ্ঞাপন করিতেছে।

এটা চৌধুরী মহাশয়ের দরবার গৃহ। আজ তিনি উপস্থিত নাই,—তবে তথায় উত্তরীয় স্বন্ধে, দীর্ঘ চৈতন, কপালে লম্বা ফোঁটা, কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বসিয়া কণ্ঠোপকণন করিতেছেন। দূরে বসিয়া কয়েকটি বিমর্ষ ব্যক্তি ব্যাকুল ভাবে চৌধুরী মহাশয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কাহারও কন্ঠাধার—

জমিদার-বাড়ী

কাহারও পিতৃমাতৃ দায়,—কাহারও বা গৃহে অনাহার ! বাহিরে
কয়েকটি অবগুণ্ঠনবতী ম্যালেরিয়া-মূর্তির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া
আছে ।

- চারিদিকেই একটা গোল,—চারিদিকেই বহু লোক জন ;
—সকলেই স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত ;—একপ রুহৎ ব্যাপার যতীন
পূর্বে কখনও দেখেন নাই । তিনি মুটেসহ সেই রুহৎ প্রাঙ্গনে
স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন । কি করিবেন,—কি বলিবেন,—
কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । একজন লোক তাঁহাকে
দেখিয়া দাওয়ান মহাশয়কে গিয়া বলিল, “একজন অতিথ ভদ্র
লোক দেখ্‌ছি ।”

দাওয়ান মহাশয় যন্তক উত্তোলিত না করিয়া গম্ভীরে
বলিলেন, “অতিথশালা দেখিয়ে দেও ।”

সে বতীনের নিকট আসিয়া বলিল, “এস, এই দিকে ।”

আর নীরব থাকি উচিত নহে তাবিয়া, বতীন স্মৃগোল দাওয়ান
মহাশয়ের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, “ললিত বাবু—”

দাওয়ান মহাশয় তদবদ ভাবের বিন্দু মাত্র পরিবর্তন
সংঘটিত না করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “কস্তাদার ?”

বতীন ক্রুদ্ধ হইলেন,—বলিলেন, “না মহাশয়—”

দাওয়ান মহাশয় তাঁহাকে আর অগ্রবর্তী হইতে দিলেন না ;
—বলিলেন, “পিতৃশ্রদ্ধ ? ভাল,—খাও দাওগে,—এ বাড়ীতে
কেহ নিরাশ হয় না !”

লক্ষ্মী-লাভ

নিশিবাবুকে সঙ্গে আনেন নাই বলিয়া বতীন মনে মনে ভগবানকে শত বক্তব্য দিলেন । না জানি তাহাকে সঙ্গে আনিলে কি একটা বিপর্যয়ই ঘটত ! অতি কষ্টে তিনি ক্রোধ সঞ্চরণ করিয়া বলিলেন, “মশায় সে সব কিছু নয় ;—ললিত বাবু আমার—”

এই সময়ে এক ব্যক্তি দাঁওয়ান মহাশয়ের কানে কানে কি বলিল,—দাঁওয়ান মহাশয় অমনই প্রায় লক্ষ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, “বল কি ?”

প্রায় গড়াইতে গড়াইতে দুই হস্তে ভর দিয়া অতি কষ্টে দাঁওয়ান মহাশয় সেই পক্ষমোদী দেহ উন্মিত করিলেন । অতি সঙ্কমে বতীনকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “প্রণাম হই,—প্রণাম হই ; বস্তুতে আজ্ঞা হোক ;—এখনই কর্তাকে সন্মাদ দিতেছি ।”

বতীন সহসা এই ঘোর পরিবর্তনের বড় একটা কারণ অনুভব করিতে পারিলেন না । তখন এই সকল বিষয়ের গবেষণা কবিস্বার মেলাজ তাঁহার ছিল না,—তিনি বলিলেন, “আমার সঙ্গে একটা গুপ্তলোক আছেন ।”

দাঁওয়ান মহাশয় অতি ব্যগ্র ভাবে বলিয়া উঠিলেন, “পড়ো একজন সঙ্গে থাকিবারই কথা । কোথায় তিনি ? এখনই পাইক পাঠাইয়া ডাকাইয়া আনিতেছি ।”

এই বৃহৎ দেহের ক্ষুদ্র মস্তিকে কোন গুরুতর গোল ঘটিয়াছে ভাবিয়া, বতীন বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলি-

জমিদার-বাড়ী

লেন, “মহাশয়, আমার সঙ্গে একটি বন্ধু আছেন, আপনি অগ্রহে
করিয়। ললিতবাবুকে সংবাদ দিন।”

দাওয়ান মহাশয় আকর্ষণ হাস্য করিয়া বলিলেন, “আজ কাল
আপনারাও সুসভ্য হইয়া পড়িয়াছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরি-
বর্তন হওয়া অসম্ভাবী। ললিতবাবু আপনার সমবয়সী,—তাহা
হইলেও আপনি কর্তার ঠাকুর মহাশয়’—তাহাকে এখনই সংবাদ
দিতেছি।”

বতীন অতি বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,
“মহাশয়—আপনি কি বলিতেছেন,—আমি তাহার কিছুই
বুঝিতে পারিতেছি’ না ?”

দাওয়ান মহাশয় নিজ উত্তরীয় গলে বেষ্টিত করিয়া গলগল-
বাসে অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, “ঠাকুর মহাশয়,—অধোনের
উপর রাগ করিবেন না ; আমি গোড়ায় আপনাকে চিনিতে
পারি নাই ! ক্রটি মার্জনা করুন,—আপনার আসিবার সবাদ
পেয়েও এ ভুল করা আমার বড়ই অজ্ঞায় হইয়াছে—ক্ষমা
করুন।”

বতীন প্রকৃতই উন্মত্ত প্রায় হইলেন, রোজে মাথা দিয়া আঙন
ছুটিতেছে ;—রেখে আসিয়া সর্ব্বাক্ষরিত করিতেছে ;—নিশি
রোজে পুঙ্খবিলী ভীরে পড়িয়া এতকণে নিশ্চয়ই নিতান্ত অধৈর্য্য
হইয়া তাহার উপর মন্বাত্তিক ক্রোধ হইতেছে ;—আর এই অপ-
দার্ষ উদ্ভাদ তাহাকে কি বলিতেছে,—তাহার মাথা যুগ্ম কিছুই

লক্ষ্মী-দাত

অর্থ নাই ! তিনি আর জোখ সম্বরণ করিতে পারিলেন না ;—
সবেগে বলিয়া উঠিলেন, “মহাশয়,—আপনি ললিতবাবুকে সংবাদ
দিবেন কিনা আমি তাহাই জ্ঞানিতে চাই ?”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মহাভ্রম

তাঁহার এই ক্রুদ্ধ, বিরক্তিপূর্ণ, তেজবান, যৌবনশূলভ উদ্বেজিত
মুষ্টি দেখিয়া, দাওয়ান মহাশয় আরও অধিকতর কাতর হইয়া
পড়িলেন, অতি বিনয়ে নানা মিষ্টি কথায় তাঁহার ক্রোধ উপশম
করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে চারিদিকে
একটা বেন মহা হলুহুল পড়িয়া গেল ; দূরে দূরে সকলে ফিসফাস
করিয়া ব্যগ্র ভাবে কথা কহিতে লাগিল। বতীন শুনিলেন,
তাহারা বলিতেছে, “আজ একটা অনর্থ ঘটিল। গুরু ঠাকুর
মহাশয় রাগ করিয়াছেন,—কর্তা শুনিলে অনর্থ করিবেন।”

দাওয়ান মহাশয়ও গলগল কৃতবাসে বলিতে ছিলেন, “ঠাকুর
মশায়,—অধীনের অপরাধ মার্জনা করুন, অধীন আপনাকে
চিনিতে পারে নাই।”

এই বলিয়া তিনি তাঁহার সেই তাকিয়া বিনিমিত মহা উদর,
ও তলোণরি স্থাপিত ক্ষুদ্র মস্তক, কষ্টে অবনত করিয়া দুই
ক্ষুদ্র বাহু বিস্তৃত করিয়া, বতীনের দুই পা কাতরে ধরিতে উদ্যত
হইলেন ;—বতীন আর সহ করিতে পারিলেন না ;—চীৎকার
করিয়া গর্জিয়া বলিলেন, “মহাশয়, আপনি কি কৈপিয়াছেন ?
আমি কায়স্থ,—আপনি প্রণাম করেন কোন সাহসে ?”

লক্ষী-লাভ

এই অত্যর্চন্য কথা শুনিয়া দাওয়ান মহাশয় তাঁহার সুগোল কুদ্র চক্ষুদ্বয় অতি বিস্মৃত করিয়া বতীনের যুথের দিকে চাহিয়া সম্পূর্ণ অবাক ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—“বলেন কি !”

এই সময় পশ্চাত হইতে কে বলিল,—“বতীন, তুমি ?
—এ কি ?”

বতীন চমকিত হইয়া ফিরিলেন। যে স্বর তাঁহার কর্ণে পশিল, তাহাতে তাঁহার অবসন্ন, বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি তীরবেগে ফিরিলেন,—দেখিলেন ললিত। সেই কলিকাতার ললিত,—সেই বামহস্তে কুক্ষিত সিমলার স্মৃতিকণ কালাপেড়ে ধুতি পরিধান,—সেই সিংহুয়ের বাড়ীর গ্রিসিয়ান স্লিপার পায়,—সেই উৎকৃষ্ট সার্ট পায়,—সেই ললিতপ্রকাশ। জমিদারীতে, ‘পল্লিগ্রামে, এই বিস্মৃত কুছারি-বাড়ীতে, তাঁহার কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই। বতীন আশ্চর্য হইলেন, বলিলেন,—“তাই, তোমাদের এ লোকটা কি পাগল ! ইনি আমার প্রণাম করিতেছেন, কি বলিতেছেন, মাধায়ু কিস্তিই বুঝিতে পারিতেছি না !”

ললিত বিস্মিত ভাবে দাওয়ান মহাশয়ের দিকে চাহিলেন ; বলিলেন,—“ইনি আমার বিশেষ বন্ধু বতীনবাবু ;—আপনি ইহাঁকে কি স্থির করিয়াছেন ?”

যে ব্যক্তি প্রথম দাওয়ান মহাশয়ের কানে কানে কি বলিয়াছিল,—দাওয়ান মহাশয় তাহার দিকে রোষকষায়িত

মহাপ্রম

লোচনে চাহিয়া বলিলেন,—“এই নম্ভার আমার এ ভুল জন্মাইয়ে দিয়েছে। এই কুবাণ্ড বলিল যে ঠাকুর মহাশয়ের আলিবার কথা আছে,—ইনিই ঠাকুর মহাশয় !”

. ললিত হাসিয়া উঠিলেন,—বতীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বতীন, কিছু যেনে করিও না। দাওয়ান মহাশয় তোমার আমাদের গুরু ঠাকুরমহাশয় স্থির করিয়াছেন। আমাদের গুরু-ঠাকুর মহাশয় বহুকাল আমাদের বাড়ী আসেন নাই ;—তিনি এক ছেলে রাখিয়া যারা গিয়াছেন। আমরা আমাদের এই নূতন গুরুঠাকুর মহাশয়কে কখনও দেখি নাই। কাল আমাদের এই নূতন গুরুঠাকুর মহাশয় এক আরজেন্ট টেলিগ্রাম করেছেন,—এখানে আজ আসবেন। থাক, কিছু যেনে কর না—এস। দাওয়ান মহাশয়, বতীনের ট্রাক আমার বৈঠকখানা বাড়ী পাঠাইয়া দিন।”

ক্রোধে দাওয়ান মহাশয় উগ্ৰকৃৎকহু হইয়াছিলেন ;—তিনি গর্জিতে গর্জিতে, “কুয়াণ্ড, নম্ভার, গড্ডলিক, বেয়াকুব” প্রভৃতি বলিয়া সেই হতভাগ্য কর্মচারীকে ভয়ঙ্কর করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন ;—চারিদিকের লোক যে কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিতেছে,—তাহাও তিনি বেশ উপলব্ধি করিতেছিলেন,—তাহাতেই তাঁহার ক্রোধ আরও অগ্নিমূর্তি ধারণ করিতেছিল ;—বাম হস্তে কষ্টে কটিবস্ত্র সবলে না ধৃত করিলে, তাঁহার বালকশ্বেদ স্বভাবকে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল।

লক্ষী-লাভ

এ স্থলে আর থাকা কর্তব্য নহে ভাবিয়া, ললিতপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে যতীনের হাত ধরিয়া নিজ বৈঠকখানার দিকে চলিলেন। যতীনও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে বহুলাভে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—“আমার বন্ধু নিশি-বাবু সঙ্গে এসেছেন !”

ললিত অতি ব্যাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কোথায় তিনি ?”

যতীন বলিলেন,—“তোমরা তাই বড় লোক, কিরূপ আদর অত্যর্থনা হবে, তিনি জানেন না,—তাই গুহুরপাড়ে বসে আছেন ;—আমি তোমায় খবর দিতে এসেছি।”

ললিত বলিয়া উঠিলেন,—“সে কি ! এখনই চল, কোথায় তিনি ? যতীন, আমি জানিতাম তোমার একটু বুদ্ধিসুদ্বি আছে ; তুমি বা তোমার বন্ধুর এ বাড়ীতে অবস্থ হবে ?”

যতীন হাসিয়া বলিলেন,—“নিশি খামখেয়ালী লোক ;—আমার যে অবস্থা হয়েছিল, তার সম্মুখে এ সব ঘটিলে, একটা বিপর্যয় ঘটিল।”

“চল—চল, কোথায় তিনি ?” এই বলিয়া ললিত অতি ব্যস্তমস্ত হইয়া দ্রুত পদে চলিলেন।

যতীন জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তোমার বাবা ভাল আছেন তো ?”

ললিত বলিলেন, “হাঁ,—তার সামান্য একটু পেটের অসুখ

মহাভ্রম

হয়েছিল,—তাই মা ব্যস্ত হয়ে টেলিগ্রাম করেছিলেন,—আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিলাম,—তোমার সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা করে আসতে পারিনি।”

• স্বতীন বলিলেন —“আমিও বড় ভাবিত হয়েছিলাম।”

“তোমার এখান পর্য্যন্ত ছুটে আসবার দরকার কি ছিল! এসেছ, ভালই করেছ,—আমাদের বাড়ী দেখা হল। আসবার আগে একটা টেলিগ্রাম কর্তে হয়। আমি টেসনে গাড়ী পাঠাতেম,—তোমাদের কত কষ্ট হল।”

“না,—এ আর কষ্ট কি?”

“তোমার বন্ধুর সঙ্গে কি আমার আলাপ নেই?”

“না,—ওবে তুমি আমাদের যেসে অনেক দিন তাঁকে দেখেছ। নিশিকাবু “ল” পড়ছেন।”

“হাঁ,—দেখেছি,—আলাপ হয়নি।”

কথায় কথায় তাঁহারা সেই বিস্তৃত দীঘির তীরে আসিলেন। বাবু ঘাইতেছেন,—সুতরাং দূরে তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে দশ বিশ জন লোক আসিতেছিল, কয়েক জন পাইক বড় বড় সোঁটা বন্ধে জমিদারবাবুর পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার সম্মাননা বজায় রাখিতেছিল। একজন ছুটিয়া সম্মুখে গিয়া পথ হইতে গাড়ী ছাগী তাড়াইতে আরম্ভ করিল,—অপর একজন পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া আসিয়া, রৌপ্যদণ্ডময় লহিত মকমলমণ্ডিত বহৎ সুন্দর ছাতি তাঁহাদের মস্তকের উপর ধরিল। আজ গ্রামে নূতন

লক্ষী-লাভ

লোকের সমাগমে,—বিশেষতঃ জমিদার বাবুর বজুর আগমনে,—
গ্রামের মধ্যে ইহারই ভিতর একটা মহা কোতুহলের তরঙ্গ প্রবাহিত
হইয়াছিল। গ্রাম্যবধূগণ গৃহপ্রাক্‌গণের অন্তরালে দাঁড়াইয়া,
অবগুষ্ঠন দ্বয় অপসৃত করিয়া তাঁহাদের পর্যবেক্ষণ করিতেছিল;—
—উলঙ্গ বালকগণ বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া দূর হইতে উঁকি
মারিতেছিল, কাছারি বাড়ীতেও একটা ছন্থুল পড়িয়া
গিয়াছিল,—কিস্ত নিশিবাবু কোথায়? তিনি নিরুদ্দেশ।

ললিত বাবু ও যতীন পুষ্করিণীতীরে আসিয়া দেখিলেন,—
কেহ কোথায়ও নাই,—রোজে চারিদিক দক্ষীভূত হইতেছে,—এ
সময়ে পুষ্করিণীতীরে কেহ থাকে না—এমন কি সার্বভৌম
বহাশয়ও তাহার দীর্ঘ মৎস্যধৃতকরণ বস্ত্র অশ্রু দীঘির তীরে
ফেলিয়া কোথায় ভিরধান হইয়াছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রবাস

ষষ্ঠীনের বহু বিলম্বে, অসীম ধৈর্যশালী নিশিবাবুও ক্রমে অর্ধেক সাগরে ওতোপো হইয়া উঠিলেন। বুকনিরে সুশীতল ছায়ায় শায়িত হইয়া, চক্ষু অর্ধউন্মিতাবস্থায় বৃষ্টির পাতাগুলির সহিত বোধ হয় ভবিষ্যত ওকালতির শত শাখা প্রশাখা পাতা পল্লবের তুলনা করিতে ছিলেন। সহসা দূরে, “উহঁ উহঁ” শব্দ ধ্বনিত হইল। এ চিরপরিচিত শব্দ তিনিতে কাহারই বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় না। নিশিবাবু বুঝিলেন, বেহালাগণ দূরে মহাসমারোহে চির প্রসিদ্ধ কোলাহলে পাকি নামক নর-বাহন লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। তিনিও সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একটু ভীত চকিত ব্যগ্র ভাবে, চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু বত দূর দৃষ্টি বায়,— কেবল স্রামল ভূশরাজি বায়ুহিল্লোলে নিজ অপক্লপ সৌন্দর্যে হাসিতেছে। পাকি দেখা যায় না।

নিশিবাবু ধীরে ধীরে নীরবে নিঃশব্দে সার্কভৌম মহাশয়ের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমুদ্রজলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবুদ-বুদ বিড়বিড় করিয়া উপরে উঠিতেছিল, ইহাতেই সার্কভৌম মহাশয়ের সার্ক সমাধি অবস্থা উদ্ভিত, তাঁহার বাহুজ্ঞান ছিল না।

লক্ষ্মী-লাভ

দুই হস্তে মন্তস্তম্ভকরণ বস্ত্রের দীর্ঘ বংশলগ্ন প্রবল বেগে ধরিত্রা, তিনি অর্ধ উৎখিত হইয়া বসিয়া, সম্মুখে মহাব্যাগ্র ভাবে হেলিয়া পড়িয়াছেন ;—পশ্চাতস্থ কচ্ছ টান পাইয়া অজ্ঞাতসারে উন্মুক্ত হইয়া কর্দ্ধমে রঞ্জিত হইতেছে ;—ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া জলের দিকে যেন ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রমে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে ! সার্কর্ভোম মহাশয়ের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ,—তাঁহার জীবন মরণ জগত সংসার যেন সেই দীঘির নীল জলে ভাসমান ফাতনার সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে ! যিনি কখনও এ অবস্থায় পতিত না হইয়াছেন,— তিনি ব্যতীত আর কেহ আমাদের “মাছ ধরার” প্রকৃত আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন না । এ অবস্থায়,—এই খোর উত্তেজক ভয়াবহ আকুলতা কালে সার্কর্ভোম মহাশয় যে নিশিবাবুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইবেন,—তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

নিশিবাবু তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার দীর্ঘ চৈতন্য দুই হস্তে ধরিত্রা প্রবল বেগে টানিবার জন্ত অতিশয় প্রসূর হইতে ছিলেন, কিন্তু নিজ অসীম আত্মসংযমশক্তিবলে নিজের দুর্দ্ধমনীয় ক্ষয়প্রবেগ উপশমিত করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন । এই সময় সহসা এক বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটিল । সার্কর্ভোম মহাশয় ভীম বলে হস্তস্থ ছিপ টানিলেন ;—সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতস্থ নিশিবাবুর স্বন্ধে পতিত হইলেন , দুই জনে আঘাতিত প্রঘাতিত হইয়া তখন গড়াইতে গড়াইতে দীঘির কর্দ্ধমাস্ত্র জলে ধরাশায়ী হইলেন ।

প্রবাস

স্বপ্নের বিষয়—নিকটে জনপ্রাণী ছিল না। নহুবা এ অবস্থা আরও ভয়াবহ ভাব ধারণ করিত,—গার্মভৌর মহাশয় নিশ্চয়ই ক্রোধে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বাইতেন। তবুও উপস্থিত তিনি বৈষ্ণব দ্বাগত হইয়া উঠিলেন, তাহাতেই তাঁহার মুখ ফেনে পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার বদনবিবরে বৈষ্ণব জল ও কর্দম সহ সেওলা প্রবেশাধিকার লাভ করিল, তাহাতে তাঁহার বিকৃত বদনের বিকৃত ফেনের ফেনহু অসুস্থান করিবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না।

সার্কঠৌম মহাশয় কর্দমে আপাদ যন্তক আশ্রুত হইয়া, উন্মুক্ত
বস্ত্রে, কম্পিত দেহে, ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।
ক্রোধে ও কর্দমে অস্পষ্ট স্বরে গর্জিয়া বলিলেন, “বেল্লিক—
বয়্যাকুব ।”

সত্যযুগ হইলে নিশিবাবু এই ব্রহ্মকোণে ভস্মীভূত হইয়া ইহ
নৌনা সাঙ্গ করিতেন;—কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এ কলিকাল !
ভস্মীভূত হইলেন না বটে, কিন্তু পচা পুতুরের পচা পীকে
নিমজ্জিত হইয়া দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিয়া পঁড়াইলেন। বতীন
কেন,—নিশিবাবুর বৃদ্ধা পিতামহী স্বয়ং উপহৃত হইলেও
তঁাহাকে তিনি এ অবস্থায় চিনিতে পারিতেন না;—নিশিবাবুর
প্রেতাত্মা ভাবিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া গ্রামসমুদয় লোককে এক
হানে জড় করিতেন।

নিশিবার উষ্ণতা। হাঁড়াইলেন,—কৃষ্ণ কর্ণযের স্রোত তাঁহার

লক্ষী-সাত

মস্তক হইতে চক্ষু, কণ, চিবুক, বদন, সমস্ত প্লাবিত ও উপপ্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে ;—তিনি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “বেল্লিক নই—বিয়াকুব বটে !”

ব্রাহ্মণ কর্দ্ধমাস্ত উত্তরীয়ে মুখের কর্দ্ধম অপসারিত করিতে গিয়া, তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করিতেছিলেন,—ইহাতে তাঁহার রাগ তাঁহার অন্তস্তল প্রদেশ হইতে ধূমগিরির উত্তপ্ত ষাণ প্রস্রবণের স্তায় ছুটিয়া আসিতে ছিল,—তিনি কম্পিত রুদ্ধ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “তু—তু—তুমি—কে হে বাপু ? বেয়াকুব, এমন মাছটা ছুটে গেল। আমি তো—তো—তোকে খড়ম পেটা কর্খো ! বেয়াকুব—বেল্লিক !”

নিশিবাবু কথঞ্চিৎ চক্ষু কণ মুখের কর্দ্ধম অপসারিত করিয়া বলিলেন, “মহাশয়, রাগ করিবেন না,—আমার অবস্থা আপনার অপেক্ষা অনেক গুণ খারাপ হইয়াছে।”

ব্রাহ্মণ অতি বিষয়ে বলিয়া উঠিলেন, “নিশি না ? তুই—তুই—”

নিশিবাবু অতি হঃষিত স্বরে বলিলেন, “আমার বুড়ো ঠাকুরমা এখন আমার দেখলে আঁতকে উঠবেন,—আপনি চিন্বেন কি করে ?”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “তুই—তুই—তুই—এখানে ? কখন এলি,—কোথায় এসেছিস ?”

নিশিবাবু বলিলেন, “পণ্ডিত মহাশয়, আপনারা সোণার-

চাঁদের পুতুলের কান্দার গঞ্জে ঐশ বায় । আগে দেহটাকে জলে
মেজে খসে নিই,—তারপর কথা হবে ।”

সার্ক্সভৌম মহাশয় নিশিবাবুর দিকে কিয়ৎক্ষণ ভীকৃ দৃষ্টিতে
চাহিয়া থাকিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন । তাঁহার উচ্চ
হাস্ত দীঘির অপর পাড়ে এক বিকট শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া
উঠিল । লহরে লহরে সার্ক্সভৌম মহাশয়ের হাসির তরঙ্গ
উঠিতেছে, হাসির আর বিরাম নাই । তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া
দুই নিতম্বে পুনঃ পুনঃ চপেটাঘাত করিয়া হাসিতে লাগিলেন । সে
শোভার বর্ণনা হয় না ।

নিশিবাবুর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে কাহারই হাস্ত
সম্বরণ করিবার সামর্থ্য ছিল না,—স্বল্প বুদ্ধা পিতামহীও হাস্ত
সম্বরণ করিতে পারিতেন না । সার্ক্সভৌম মহাশয়ের অবস্থা
আরও শোচনীয় হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নিশিবাবু হাসিলেন না,
তাঁহার মুখ কুঞ্চিত পর্য্যন্ত হইল না,—তিনি লক্ষ দিয়া জলে
পড়িলেন ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মণ-বাড়ী

বহুকাল পূর্বে সার্কভৌম মহাশয় এক সময়ে কলিকাতায় এক ক্ষুদ্র বাঙ্গলা স্কুলে লাঠি ক্লাসের সাড়ে সাত টাকা মাহিনায় পণ্ডিত করিতেন। আর ঐ সতন্ত্র সাড়ে সাতের সংখ্যা একটু বৃদ্ধি করিবার ব্যাকুলতায়, সকালে ও সন্ধ্যায় বাহিরেও একটু পণ্ডিত্ব করিতেন। যখন নিশিবাবু বৃদ্ধা পিতামহীর সহিত কলিকাতায় আবাস লইয়া বর্ণপরিচয় উদ্বৃত্ত করিবার আশায় পুনঃ পুনঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থানুকূল্য করিতে ছিলেন, সেই সময়ে সার্কভৌম মহাশয় কোন সময়ে তাঁহার শিক্ষকতা কার্যে নিবৃত্ত হইলেন,—তদবধি পরিচয়। সেই পর্য্যন্ত সার্কভৌম মহাশয় নিশিবাবুকে এক দিনের তরেও দৃষ্টির বহির্ভাগে বাইতে দেন নাই! আজ নিশিবাবু সেই বহুকালের বর্ণপরিচয় পরিত্যাগ করিয়া গুরে গুরে নানা গুর অতিক্রম করিয়া আইনকাননে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন,—কিন্তু সার্কভৌম মহাশয় তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেন নাই। বাৎসরিক আদায়ে এক দিনের জন্মও তাঁহার জটী হয় নাই। বৎসরের পর বৎসরে বৎসরে নিশিবাবু ভূতপূর্ব শিক্ষক মহাশয়ের বধাবিহিত পূজা দিয়া আসিতেছেন। পুরাকালে কয়েকজন পাঠশালার বর্ণপরিচয়ের ছাত্র তাঁহার

ব্রাহ্মণ-বাড়ী

হস্তস্থ হওয়ার সার্কভৌম মহাশয়ের দুই পয়সা আজও বেশ সংগ্রহ হইয়া থাকে। কলিকাতায় বহু দিন বসবাস ছিল, তত দিন বৎসরে বৎসরে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র খোলা-নিবাস নানা রঙ্গের কাগজে সুরঞ্জিত ও ভিক্সার্কিত নানা পুষ্প ও পত্রহারে সুশোভিত করিয়া মা সরস্বতীর অর্চনা করিয়া ছাত্রবৃন্দের নিকট বেশ দুই পয়সা প্রণামি লাভ করিতেন। এক্ষণে দেশে প্রত্যগত হইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হয়েন নাই—সরস্বতী পূজার অববাহিত পূর্বে এক-বার কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া, ছাত্রবৃন্দের নিকট করাদায় ত্রুতে নিযুক্ত হয়েন। বহু পূর্বের শিক্ষামন্দিরের প্রথম দাবী-দারের মান রক্ষা করিতে এক্ষণে যৌবন প্রাপ্ত উকীল বা ভাবী উকীল, হাকিম বা ভাবি হাকিম প্রভৃতিগণ কখন কোন ক্রটি করিতেন না। দ্বৌপাথে ব্যাগ পরিপূরিত করিয়া সার্কভৌম মহাশয় দেশে ফিরিতেন,—আবার নিমন্ত্রণপত্রও যথাসময়ে ডাক যোগে রওনা হইত,—ডাকযোগে মনিঅর্ডার রূপ ডাক-বাহনে কানুনমালা আসিতে ক্রটি হইত না। এইরূপে সার্কভৌম মহাশয় দূর পল্লিগ্রামে একরূপ বৃদ্ধ বয়সে রাজার হালে বাস করিতেছেন। অধিকন্তু চৌধুরী মহাশয়ের পার্শ্বতরপদে অধিরূঢ় থাকায়, ভবিষ্যৎ বাড়ী হইতে প্রায় সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই সংগ্রহ হইত। সার্কভৌম মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের শিক্ষকতা বখা যায় নাই।

নিশিবাবু অবগাহনান্তর তীরে উঠিয়া ইন্নি বিলট সাটে

লক্ষী-লাভ

মস্তকাদি যথাসম্ভব বিকৃত করিয়া লইলেন ; তাহার পর বলিলেন, “পণ্ডিত মহাশয়,—চলুন, আজ আপনার ওখানেই প্রসাদ পাইব।”

সার্কভৌম মহাশয় হস্ত সম্বরণ করিয়া ছাত্রের দত্ত একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নিশি বড় লোক, সে তাঁহার কুটিরে আহার করিবে,—এতো পরম সৌভাগ্যের কথা ! তিনি ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, “এস বাবা এস,—এষে আমার তাগা।”

সহসা নিশি তাঁহাদের এই দূর পল্লিগ্রামে কেন আসিয়াছে,—কখন আসিয়াছে,—কাহার সহিত আসিয়াছে,—এ সকল চিন্তা করিবার অবসর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রহিল না ;—“এস বাবা,—এস বাবা,” বলিয়া তিনি তদবস্থায়ই অগ্রসর হইলেন, এমন কি তাঁহার অতি আদরের মৎস্যধৃতকরণ-বস্ত্র অথবো সেই দৌধির তীরে পতিত রহিল।

নিশিবাবু কটে হৃদয়ভেদী হস্তবেগ দস্তে দস্তে পেশিত করিয়া, সেটু দুর্দমনীয় হস্তলহরী উদরে লুকাইত রাখিয়া, গুরুর পদাঙ্গুলস্বরণ করিলেন। বৃদ্ধ গুরুর আপাদ মস্তক কর্দমাধ্বত দেহের বিভৎস ভাব তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিত্যম কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিলেন না। কাজেই গ্রামে তাঁহারা প্রবেশ করিবামাত্র, চারিদিকে একটা যুদ্ধ হস্তলহরী ছুটিল ! কুবকগণ হাল স্বন্ধে গৃহে কিরিতেছিল,—সার্কভৌম মহাশয়কে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বিম্বিত ভাবে তাঁহার

ব্রাহ্মণ-বাড়ী

মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ভয়ার্থে ও মাত্কার্থে, কষ্টে হাত-বেগ সঞ্চার করিয়া অল্প দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। গ্রাম্য ললনাগণের অবগুষ্ঠনাস্তরালঙ্ঘিত শৃঙ্গোল ওষ্ঠ হান্তে বিভাসিত হইল,—দৃষ্ট বালকগণ ধিল ধিল করিয়া হাসিতে হাসিতে দূরে পলাইল। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন,—বলিলেন, “বাবা নির্মল,—তোমার আধুনিক সিন্ধু অবস্থা একটু হাস্তজনক হইয়াছে দেখিতেছি। পল্লিগ্রামের সরল প্রকৃতি লোক স্বভাবতঃ একটু কোহুকপ্রিয় হয়।”

নিশিবাবু গভীর ভাবে কেবলমাত্র বলিলেন,—“দেখিতেছি।”

সার্কৌষ মহাশয় বলিলেন,—“তবে তুমি ইহাদিগকে সভ্যতাপূত্র বলিতে পার না। বোধ হয় লক্ষ করিয়াছ,—ইহারা তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিতেছে না,—আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করা অজ্ঞায় বলিয়া ইহাদের জ্ঞান আছে। পল্লিগ্রাম-মাত্রই অসভ্যস্থান নহে।”

নিশিবাবু বলিলেন,—“তাহা দেখিতেছি।”

এই সময়ে দূরে অলক্ষ হইতে বালশুলভ স্বরে ধ্বনিত হইল—
“বামন কাকা, বামন কাকা গোবর মেখেছে।”

ব্রাহ্মণ উদ্‌গ্ৰীব ভাবে চারিদিকে চাহিলেন, কিন্তু কোথায়ও কোন বালক দেখিতে পাইলেন না, কেবল তাহাদের ধিল ধিল হাস্যধ্বনি চারি দিকে স্তরে স্তরে ধ্বনিত হইতেছিল।

লক্ষ্মী-লাভ

বুদ্ধ বলিলেন,—“আমি কি বিশেষ কৰ্ম্মমাগ্নু হইয়াছি বলিয়া বোধ হয় ?”

নিশিবাসু বলিলেন,—“বিশেষ নয়।”

সার্কভৌম মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—“তোমার দেহটা কিঞ্চিৎ হাস্যোদ্বোধক হইয়াছে।”

“সম্ভব,—না হওয়াই আশ্চর্য্য।”

“কিন্তু বাপু,—তুমি আমার আদমোনী রুহিতটা নষ্ট করিয়াছ। টান দিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম,—মৎস্তটা বিশ সেরের এক ছটাক ওজনে কম ছিল না।”

“আমি আদমোনটা বাদ দিয়া কেবল ছটাকটা খেতে পেলেই খুশি হইতাম।”

সার্কভৌম মহাশয় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন ;—
বলিলেন, “হা, হা,—তুমি একথা বলতে পার,—খুব বলতে পার,—তবে গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ী অনাদর হবে না। সে হয় বড় লোকের বাড়ী—নয় কি বাবা ?”

এই সময়ে কে অতি সুস্থ মধুর কিকিনীর মিষ্ট শব্দের জায়
ঘরে, বিশ্বরে বলিয়া উঠিল,—“দাদা এ কি মৃষ্টি !”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পত্রলেখা

নিশিবাসু সন্মুখে বে দৃশ্য দেখিলেন, পূর্বে জীবনে তিনি আর তেমনটা কখনও দেখেন নাই। সন্মুখে একখানি প্রকৃতই ছবি।

যেদি পাতায় জড়িত, শোভিত, অতি সুন্দর বেড়া ;—বেড়ার পার্শ্বে অতি পরিষ্কার, অতুলনীয় ভাবে সজ্জিত, নানা রঙের সুন্দর সুন্দর ফুলে অগঙ্কত ক্ষুদ্র বাগান। বাগানের পার্শ্বে একখানি ষোড় ষড়,—যুক্তিকাশ্রাটীয়ে বেষ্টিত,—যেন ঝঙ্কঝঙ্ক করিতেছে! ঘরবাণি যেন ছবি !

কমনীয় নারী হস্তে অতি বহু লালিত পালিত, জল সিক্ত, বিশেষ আয়াসে রক্ষিত, না হইলে এমন সুন্দর ফুল, এমন অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে চারিদিক আলো করিয়া, ফুটিত না! লতাগুলি এমন করিয়া ফুল-ফল-বল্লরী ভূষণে ভূষিতা হইয়া জড়াইয়া জড়াইয়া বেড়াটি এমন সুন্দরভাবে সাজাইত না! সুন্দর বাগানের সন্মুখে সুন্দর ঘর,—ক্ষুদ্র কিন্তু মনোহর। সেই গৃহের সন্মুখে, এই সুন্দর উদ্যানের মধ্যে, চারিদিকে পুষ্পগন্ধে প্রাণিত করিয়া দগুণমানা—এক দেবী-মূর্তি!

লক্ষী-লাভ

বিভূত শ্রামল প্রান্তর,—তাহার পর ভাল সুশোভিত দীঘির ধার,—তাহার পর গ্রাম্য কৃষক প্রভৃতির ভগ্ন, অর্ধ ভগ্ন, অপরিষ্কৃত গৃহ, অঙ্গন পার্শ্বস্থিত আম জাম কাঠালের ক্ষুদ্র বৃহৎ বাগান ;—মধ্যে মধ্যে বাঁশ কাডের পার্শ্বস্থিত ডোবা, পচা পুকুর, ধান। নিশিবাবু ইহাই দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলেন,—সহসা তিনি সম্মুখে মরু মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র জলস্থান সদৃশ এই সুন্দর উদ্যান ও সুন্দর গৃহ দেখিয়া বিম্বিত হইয়া স্তম্ভিত তাবে দাঁড়াইলেন। তাঁহার স্তম্ভিত হইবার কারণও ছিল,—সম্মুখস্থ দেবী-মূর্তি।

কিন্তু বহুক্ষণ বিম্বিত হইয়া থাকিবার পাত্র নিশিবাবু নহেন,—বিশেষতঃ মধুর ষিল ষিল অঞ্চলারূত হান্তধ্বনিতে নিমিষে তাঁহাকে কল্পনার অমরকানন হইতে সাক্ষাৎস্বরূপ মরু লগতে আনিয়া ফেলিল। তখন তিনি দৌধলেন, তাহার সম্মুখে একটা সুন্দরী বালিকা মুখে অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া, ষিল ষিল করিয়া হাসিতেছে! বালিকার বয়স প্রায় পঞ্চদশ,—নিমিষে যত দূর বুঝিয়া লওয়া সম্ভব, সেই অভিন্ন সময়ের মধ্যে নিশিবাবু বুঝিলেন,—বালিকা সুন্দরী, অপূর্ণ সুন্দরী—অবিবাহিতা কুমারী,—প্রাঙ্গণকন্যা!

সার্বভৌম মহাশয় ভৎসনার স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “পাগলী !—কোন লোকের হস্তোদীপক অবস্থা দেখিয়া হান্ত করা কর্তব্য নয়। ইনি আমার ছাত্র নিশি,—দৈব দুর্ভাগাকে জলদাতা হইয়াছিলেন! নিশি, পত্রলেখা আমার দৌহিত্রী!”

পত্রলেখা

বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল,—“দাদা, তঁকে দেখে আমি হাসছি না। তোমার এ কি মূর্ত্তি হয়েছে?”

বুড়, “আমার” বলিয়া প্রায় লক্ষ দিয়া উঠিলেন। একবার নিশিবাবুর দিকে চাহিলেন,—একবার বালিকার দিকে চাহিলেন,—ব্যাপারখানা কি ভালরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

অপরিস্ফুট লোক দেখিয়া বালিকা সলজ্জ ভাবে অতি কষ্টে হাস্ত সম্বরণ করিয়া, এক পার্শ্বে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; বলিল,—“দাদা, এত কাদাঘাটা কোথায় মাথলে? বাও—বাও, শীত চান করে ফেল।”

সার্কর্ভৌম মহাশয় বলিলেন, “তবে গ্রামের ছুটগণ আমার দেখিয়াই কৌতুক করিতেছিল?”

তিনি নিশিবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“নিশি, বাপু, তোমার এ কথা আমার বলা উচিত ছিল।” তাহার পর সেই প্রাচীন আমলের ভীতিসঙ্কারক দৃষ্টিতে ছাত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“তোমার চরিত্রের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই দেখিতেছি।”

নিশিবাবু মস্তক কণ্ঠয়ন করিতে করিতে বিনীত স্বরে বলিলেন,—“পণ্ডিত মহাশয়, আপনি কতবার বলিয়াছেন মৎস্য ধরিতে গেলেই কাঁদা মাধিতে হয়, সেই জন্ত আপনার কাঁদা মাধা গা দেখিয়া ভাবিলাম,—এটা মাছ ধরবার কায়দা।”

লক্ষ্মী-গাত

সার্বভৌম মহাশয় বলিলেন,—“এতরূপ নয়। বাক—পত্রলেখা, নিশিকে বস্ত্রাদি দেও,—আমি অবগাহন করিয়া আসিতেছি।”

ব্রাহ্মণ সত্তরপদে গৃহের পশ্চাৎ দিকে ধাবমান হইলেন,— নিশিবাবুর মস্তক কণ্ঠন অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। প্রায় পূর্ণ বৌবনা বালিকার সহিত কথোপকথন বাপারে তিনি একবারেই অভ্যস্থ ছিলেন না।—স্রীলোক দেখিলে তিনি আতঙ্কে সে স্থান অটরে পরিত্যাগ করিতেন। অদ্য সহস্র! এই পল্লিগ্রামে, আম, কাঠাল, জাম বনের ভিতর, এই নারীরূপী পুষ্পের সংবর্ষণে আসিয়া তিনি কিংকর্ষবাবিষ্য হইয়া পড়িলেন।

বালিকাও অবনত মস্তকে দণ্ডায়মানা ছিল,—এই অপরিচিত যুবককে তাহাদের একখানা কাপড় আনিয়া দিবে,—না ইঁহার সহিত ইঁহার নিজের বস্ত্রাদি আছে,—বালিকা তাহা স্থির করিতে পারিল না। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল,—পদাঙ্গুলি দিয়া যুক্তিকা ধনন আরম্ভ করিল। নিশিবাবুরও সঙ্গে মস্তক কণ্ঠন চলিল,—উভয়ের কেহই কাহারও মুখের দিকে চাহিতে সাহস করিলেন না। লজ্জা মাতৃষের চির সহচর,—নিশিবাবু আত্ম পরাভূত।

অবশেষে বালিকা অবনত মস্তকে অতি মৃদু স্বরে বলিল,—
“আপনার কাপড় সঙ্গে আছে, কি?”

নিশিবাবু ভীম বলে মস্তক কণ্ঠনপর হইয়া প্রায় অড়িত স্বরে বলিলেন,—“না।”

পত্রলেখা

বালিকা সত্বর পদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। নিশিবাবু সেই গৃহপ্রাঙ্গণে সিন্ধু বসনে দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাঁহার জীবনের ঘটনাচক্রে পরিবর্তনশীলতার বিষয় গবেষণা করিতে লাগিলেন।

নিমিষমধ্যে পত্রলেখা দাদা মহাশয়ের সর্কোৎকৃষ্ট গরদের খুঁটি ও উত্তরীয় আনিয়া নিশিবাবুর হস্তে দিয়া ভিতর হইতে পা ধোতকরণ জল ও এক জোড়া ষড়্‌ম আনিয়া দাবার উপর রাখিল। একখানা গালিচা পাতিয়া দিয়া বলিল,—“আপনি এখানে একটু বসুন,—আমি আপনার জল ধাবারের বন্দোবস্ত করিতে যাই, দাদা এখনই আসিবেন।”

নিশিবাবুর মুখ হইতে ভাল মন্দ কোন কথাই বাহির হইল না। তিনি এই সরলা কমলা গ্রাম্যবালিকার নির্মল রূপে একেবারেই পিহল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিশোর যৌবন-বালিকার প্রতি অঙ্গে জ্বড়া করিতেছিল,—তাঁহার কৃষ্ণ কেশরাশি নিবীড় জলদের আয়তাহার স্বন্ধে ও পৃষ্ঠে পড়িয়া বায়ুতরে তুলিতেছিল। বালিকার মুখপানে চাহিতে নিশিবাবুর সাহস হইল না।—তিনি নীরবে অবনত যন্তকে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

বালিকা অন্তর্হিতা হইল। নিশিবাবু আজ প্রথম অন্ধকার কি তাহা উপলব্ধি করিলেন, পত্রলেখা চলিয়া গেলে, তাঁহার মনে হইল যেন সহসা পৃথিবী এক মহা আঁধারে ঘিরিল, চক্ষুর সম্মুখ হইতে কে যেন সহসা বিশ্বের উজ্জ্বল প্রদীপ সরাইয়া

লক্ষী-লাভ

লইল। নিশিবাবু মনে মনে বলিলেন,—“সুন্দরী যথার্থই সুন্দরী।”

তিনি বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া একবার নিজ বৃত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,—মনে মনে হাসিলেন। দুই ফেননিভ পট্টবস্ত্র পরিধান,—পট্ট বস্ত্রের উত্তরীয় স্বন্ধে,—পদযুগল খড়মে সুশোভিত,—গলায় পইতা তো আছেই। নিশিবাবু মনে মনে বলিলেন,—“কপালে কোঁটা ও মাথায় একটা লম্বা চৈতন মাজের অভাব। কে বলিবে ইনিই ভাবি উকিল বা হাইকোর্টের জজ?”

এই সময়ে দুই ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদ নিয়ে ভূমিসাৎ হইল;—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—“আমুন, পাকী এসেছে। টেনসন থেকে ছুটে আস্চি। গরীবদের ক্রটি মাপ কর্কেন,—কর্তা শুন্লে আর রক্ষা রাখবেন নঃ।”

দ্বিতীয় অঙ্ক বিভূষণ



“আপনি এখানে একটু বসুন।”

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুমি

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্ত্রীগৃহে,—হিন্দুর চিরপূজা উপকরণ
আতপ চাউল, কাঁচকলা, বাতাসা, চিনি, ঘেদোমোতার কখন
অভাব ঘটিত না; স্ত্রীর পত্রলেখা অতিথির জন্য পরিষ্কার
কুকুরকে খেত পাথরের স্তম্ভের রেকাবিতে, নানাবিধ কস মূল
নিষ্টার অতি সুচারুরূপে সাজাইয়া,—বাম হস্তে রেকাবি-
বানি ও দক্ষিণ হস্তে গেলাসে সুরীতল পরিষ্কৃত জল লইয়া, বাহির
বাটীতে আসিল; সে দুষ্ট স্তম্ভের,—রমণীয়,—মনোমুগ্ধকর,—
চিত্রকরের তুলিকার জন্য,—লেখকের লেখনীর জন্য নহে।

দুঃখের বিষয়, দুর্ভাগ্যবান নিশিবাবু এ অপব্রণ চিত্র
দেখিতে পাইলেন না;—তিনি গুমি হইয়াছেন! তাঁহার এ
অনুপমের সুখ অদৃষ্টে ঘটিল না।

বাহিরে জনশ্রুত,—নিশিবাবু অন্তর্ধান! একটু বিব্রিত
ভাবে রেকাব ও জল হস্তে পত্রলেখা দাঁড়াইল,—চারিদিকে
সলজ্জ ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল,—কিন্তু বতরুর তাহার
দৃষ্টি চলে,—তাঁহার মধ্য কোন স্থানে জনমানবের কোন চিহ্ন
দেখিতে পাইল না। দূরে একটা শালিক পথের উপর নাচিয়া
নাচিয়া বেড়াইতেছে;—সঙ্গে সঙ্গে মবদুর্কাদল মধ্যস্থ ফড়িংয়ের

লক্ষ্মী-লাভ

প্রাণান্ত খটিতেছে। একটা দয়েল গাছের ডালে বসিয়া, থাকিয়া থাকিয়া মধুর স্বরে শিস্ দিতেছে। দুই একটা প্রজাপতি সেই দুই প্রহরের রৌদ্রে বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় ছায়ায়—ফুলে ফুলে মধু আহরণ করিতেছে। সার্কভৌম মহাশয়ের ক্ষুদ্র গৃহ চিত্রকরের হস্তপ্রসূত সুন্দর চিত্রের স্তায় সূর্য্যের সতেজ আলোকে বিমল শোভায় ভাসিতেছে।

নিশিবাবু নাই। পত্রলেখা দাওয়ার উপর মিষ্টানের রেকাব ও জলের গেলাস রাখিয়া, দুই পদ অগ্রসর হইল,—কিন্তু তাহাকে “হুস্” শব্দ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিতে হইল। দুই চারিটা কাল কাক,—এ ও সে বিভিন্ন চালের উপর হইতে উড়িয়া আসিয়া,—দূরে দূরে বসিয়া,—মিষ্টান্নপাত্রের উপর তাহাদের গোল কৃষ্ণ নয়নের প্রথর দুটি নানা ভঙ্গিতে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। পত্রলেখা কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই দাওয়ার সম্মুখে একখানি ছবির স্তায় দণ্ডায়মানা রহিল। মধ্যে মধ্যে ব্যগ্র, উদ্‌গ্ৰীব, উৎসুক ভাবে, দূরে সম্মুখে চাহিতে লাগিল,—কিন্তু নিশিবাবু প্রত্যাগত হইলেন না।

তখন সে খাবার ও জল লইয়া বীয়ে বীয়ে, বাড়ীর ভিতর চলিল;—সম্মুখে সার্কভৌম মহাশয়। সিন্ত বস্ত্রে,—গামছা স্বন্ধে,—গাড়্ হস্তে,—নানা নোক আওড়াইতে আওড়াইতে, অগ্রসর হইতেছেন;—পত্রলেখাকে দেখিয়া দণ্ডায়মান হইলেন;—

শুনি

বলিলেন,—“তোকে বাবুর বাড়ী লইয়া বাইবার জন্য পাত্তা আসিয়াছে,—এখনই যা । তাঁদের গুরুঠাকুর মহাশয় এসেছেন,—খাবার দাবার জোগাড়ব্বর করে দিতে হবে,—যা এখনই যা ।”

এতক্ষণে ব্রাহ্মণের নাতিনৌর হস্তস্থিত মিষ্টান্নের প্রতি দৃষ্টি পড়িল,—তিনি বলিলেন,—“মিষ্টান্ন প্রত্যাবর্তন করিতেছ কেন নিশি কোথায় ?”

পত্রলেখা হাসিয়া বলিল,—“দাদা, তুমি বুড়ো হয়েছ,—তোমায় বত জোচ্চরে ঠকায়।”

নাতিনৌর এই অত্যদ্ভুত কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিছুই ভাবার্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাহার মূখের দিকে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিলেন । তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—
“সে কি ?”

পত্রলেখা তাহার মধুর হাসিতে চারিদিক বিভাসিত করিয়া বলিল,—“হ্যাঁ,—দাদা, তুমি বত জোচ্চরকে বাড়ী আন ।”

সার্বভৌম মহাশয় অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন ;
“জুয়াচোর,—সে কি ?”

পত্রলেখা বলিল,—“তুমি যে লোকটাকে সঙ্গে করে এনেছিলে,—আমি তোমাএ ভাল গরদের কাপড়, চাদর,—তোমার হাতীর দাঁতের ঝড়ম,—এনে তাকে দিয়েছিলাম,—সে, সে সব নিয়ে লম্বা দিয়েছে ।”

লক্ষী-লাভ

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের যে ভাব হঠল,—তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই! তিনি অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত জিহ্বা দস্তে কাটিলেন,—চক্ষু আকর্ণ বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন,—তাহার দুই হস্ত দুই দিকে বিস্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল,—তিনি প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—“এ কথা যুখেও আনিও না।”

পত্রলেখা ছাডিবার পাত্রী ছিল না;—সে পূর্বরূপ হাসিতে হাসিতে বলিল,—“আর যুখেও আনিব না। এতক্ষণ দেখগে তোমার গরদের কাপড়, চাদর, খডম নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠল।”

ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—“পাগলী,—একেবারে পাগলী। নিশি বড় লোকের ছেলে, আমার ছাত্র,—যা তুই বাবুদের বাড়ী যা, আমি তাহার অনুসন্ধান লইতেছি।”

“ষ্টেসনে গিয়ে খবর নেও।” এই বলিয়া পত্রলেখা হাসিতে হাসিতে তথা হইতে পলাইল,—বুদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রিয় ছাত্র নিশিকান্তের অনুসন্ধান বাহিরের দিকে চলিলেন।

কিন্তু পত্রলেখা আজ সহসা এত বিচলিতা হইল কেন? আজ তাহার চির-প্রক্লিষ্ট আনন্দকাননসদৃশ সুন্দর সুকোমল হৃদয় সহসা কি বেন এক মেঘে আবরিত হইল কেন? সে আপনা আপনি আজ এত লজ্জা বোধ করিতেছে কেন? সহসা

এই অপরিচিত বুঝকে দেখিবারাত্র তাঁহার মূর্তি তাহার হৃদয়ে
অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে কেন ?

বাবুর বাড়ীর দাসী ও দারবান পাকী লইয়া দণ্ডায়মান ছিল,
—পত্রলেখা আর অধিক কিছু চিন্তা করিবার সময় পাইল না,
—পাকীতে গিয়া উঠিল। তখন পাকী ছ'ছ' শব্দে চৌধুরী
মহাশয়ের বিস্তৃত অট্টালিকার পশ্চাৎ দিকে প্রবেশিত হইল।

বাবুর বাড়ীতে তাহার প্রায়ই আত্মান হইত। ললিত-
প্রকাশের একমাত্র অতি আদরের ভগিনী সুবাল। তাহার প্রিয় সখী
ছিল,—উভয়ে পরস্পরে উভয়কে সহোদরা ভগিনী অপেক্ষাও
ভাল বাসিত,—উভয়ের গলায় গলায় ভাব;—সেই জন্মই বৃদ্ধ
সার্বভৌম মহাশয়ের গ্রাম মধ্যে এত প্রতিপত্তি, শ্রদ্ধা, ভক্তি,
মান্ত;—তাহার্তেই তাঁহার এত সচ্ছলতা,—এত সুখ সুখি।
পত্রলেখাকে না পরাইয়া সুবাল। কোন ভাল বস্ত্র পরিচ্ছন্ন না,—
তাহাকে না ধাওয়াইয়া কোন ভাল জিনিষ মুখে দিত না,—
দিবসের মধ্যে অন্ততঃ একবার সুবাল। তাহাকে লইয়া বাইবার
জন্ত পাকী পাঠাইত;—সেও প্রায় তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে
আসিত। যে ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান আমরা দেখিয়াছি,—তাহা
তাহাদেরই ছুইহস্তে রচিত নন্দন-কানন।

পাকীতে উঠিয়া চির প্রকৃষ্ণমুখী, লাবণ্যময়ী পত্রলেখা আত্ম
বিষয়া;—নিশিবারু যে গরদের বস্ত্রাদি লইয়া চক্ষুদান দিয়া
লখা দিয়াছেন,—এ কথা পত্রলেখা একবারও বিশ্বাস করে নাই।

লক্ষ্মী-লাভ

—চোর ও ভদ্রলোক দেখিয়া তাহাদের পার্থক্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট জন্মিয়াছিল,—তবে নিশিবাবুর সহসা অন্তর্ধ্যানে সে একটু বিস্মিত হইয়াছিল। ভাবিল, হয়তো তিনি বাহিরে একটু বেড়াইতেছেন,—দাদা বাহিরে গেলেই তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন।

অল্প দিন পত্রলেখা উৎফুল্লহৃদয়ে প্রাণ সখী স্নবালার নিকট ছুটিত,—আজ তাহার হৃদয়ে সে প্রাণের উৎসাহ,—সে প্রফুল্লতা—সে উৎফুল্ল ভাব নাই! আজ কেন সে এমন বিবৰ্ণতা অনুভব করিতেছে। সে মনে মনে বলিল, “বাড়ীতে অতিথি আসিয়াছেন,—দাদার ছাত্র,—আমার ষাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল;—আজ আমার বাড়ী ছাড়িয়া ষাওয়া উচিত হয় নাই।”

তাহার পর সে ভাবিল, “পিসিমা আছেন—তিনিই সব করিবেন;—দাদামশায় আছেন,—আমি না গেলে স্নবালা রাগ করিত!”

আজ পত্রলেখার চির শান্তিপূর্ণ হৃদয়-সরোবরে অতি প্রবল ঝটিকার হিলোল বহিয়াছে! আজ সহসা তাহার ক্ষুদ্র পল্লি-প্রাণের ক্ষুদ্র সরল জীবনে এক ঘোর পরিবর্তন ঘটিয়াছে,—আজ আর সে, সে পত্রলেখা নাই।

পাকীর ভিতর বসিয়া, পত্রলেখা নিজ উবেলিত হৃদয়কে সংযত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছিল;—সে বতই

হৃদয় হইতে তাহার অবাচিত চিন্তাস্রোত দূর করিবার চেষ্টা পাইতেছে,—ততই তাহার মুখ,—তাহার কমনীয় অতুলনীয় লাবণ্যপূর্ণ মুখ,—লাল হইতে লাল হইয়া অপক্লপ সৌন্দর্য্যবিস্তার করিতেছে। পত্রলেখা তাহা বুঝিতে পারিতেছে,—তাহাই সে তাহার হৃদয়কে উপশরিত করিতে চেষ্টা পাইতেছে,—একপভাবে সে কিরূপে তাহার প্রাণের সজিনী,—স্নেহের ভগিনী,—হৃদয়ের সখীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে? সুখালা কি বলিবে।

জমিদার বাড়ী উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পত্রলেখা পাকীর দ্বার নিশ্চয় ঈষৎ উদ্বুদ্ধ করিল,—সেই ঈষৎ উদ্বুদ্ধ পথে তাহার সুন্দর চক্ষের একটি চক্রে দ্রুতগমনশীল বেহারাগণ মহা'রোলে তাকে কোথায় লইয়া বাইতেছে,—তাহা দেখিবার চেষ্টা পাইল;—বুঝিল,—পাকী জমিদার-বাড়ী বাইতেছে না,—অন্ত দিকে ছুটিয়াছে।

সে বিস্মিতা হইল,—একটু ভীতাও হইল; কিন্তু দাসী বাম হস্তে তাহার পাকীর দরজা ধরিয়া, কটীতে অক্লস স্পৃহিত ভাবে বন্ধন করিয়া, ওষ্ঠে ওষ্ঠ পেশিত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দুলাইতে দুলাইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়াছে। পক্ষান্তে বৃহৎ লগুড় বন্ধে বৃহৎ বশুসমন্নিত রায় সিংহ লক্ষ লক্ষ ছুটিতেছে,—স্মরণ্য পত্রলেখার ভয়ের বিলুপ্ত কারণ ছিল না। হৈ হৈ শব্দে পাকী ধাবিত হইতেছে,—গ্রাম্য পাছগণ জমিদার-বাড়ীর পাকী

লক্ষী-লাভ

দেখিয়া পথের ধারে নামিয়া দাঁড়াইতেছে ;—গ্রাম্য ললনাগণ
ঘরের অন্তরাল হইতে অবস্ফুৰ্ণের ভিতর দিয়া উঁকি মারিতেছে ;
—ছাগী, গাভীগণ বেহারার চীৎকারে ভীত হইয়া তড়ু তড়ু ছড়
শব্দে মাঠের দিকে ছুটিয়া নামিতেছে ! কাক, শালিক, দয়েল,
ঘুঘু বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে উড়িয়া বসিতেছে ! সহসা হুঁ হুঁ শব্দে
বেহারাগণ তাহাদের কলরব বন্ধ করিয়া, নরবাহনস্বান এক
বিস্তৃত প্রাঙ্গণে নামাইল। ঘর-পার্শ্ব হইতে উঁকি মারিয়া
পত্রলেখা দেখিল, সে চৌধুরী মধ্যশয়ের বিস্তৃত ঠাকুরবাড়ীতে
নীত হইরাছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্ধুসন্ধান

সার্বভৌম মহাশয় যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে বজ্রাদি পরিবর্তন করিয়া লইলেন। স্নানের পর আঙ্গিক ক্রিয়া সমাপনের জন্য তিনি পটুবস্ত্র পরিধান করিতেন, আজও তাহাই হইল ;—কিন্তু আজ নিত্যনৈমিত্তিক চিরপ্রচলিত আঙ্গিক কার্যে অবহেলা ঘটিল,—তিনি নিশির সন্ধানে বাহিরে আসিলেন।

নিশি নাই,—নিশি যেন সহসা বাতাসে কর্পূরাসবের মত উড়িয়া গিয়াছে। ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ এ দিক ওদিক চারিদিক সন্ধানলেন, কিন্তু নিশি কোথায়ও নাই! তিনি বাড়ী ছাড়িয়া গ্রাম্য পথে আসিলেন,—ছুই প্রহরের রোজে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে ;—এ সময়ে যে বাহার গৃহে আহারাদিতে নিযুক্ত আছে,—পথে লোক জনের কোন চিহ্ন নাই!

বৃদ্ধ সার্বভৌম মহাশয় মনে মনে বলিলেন, “বানর! নিশিটার চরিত্র কিছু মাত্র পরিবর্তন হয় নাই,—সেই পূর্বের মতই উদ্ধাঙ্গ আছে! নিশিটাই একটু কৌতুক করিবার জন্য, এই-খানেই কোথায় লুকাইয়াছে।”

লক্ষী-লাভ

তিনি নিকটস্থ আম জাম কাঁটালের ঝোপ,—বৃক্ষের অন্তরাল,—
—গৃহের কোন,—যেদিক বেড়ার পার্শ্বে—চারিদিকে,—নিশিরূপ
পলাতক ছেলের সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই তিন
বার বজ্রগন্তীর স্বরে ডাকিলেন, “নিশি। নিশি,—বাপু এই
দিকে এস।”

সে পিলে আতঙ্কদায়ী বজ্রগন্তীর স্বরে নিশ্চয়ই নিশিবাবু
পূর্বের সেই বর্ণপরিচয়ের ভীতিপূর্ণ কালের কথা স্মরণ
করিয়া আতঙ্কে আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন,—কোভুক তাঁহার
পেটের ভিতর প্রবেশ করিয়া লুকাইত হইত,—তিনি সেই
পূর্বরূপ ভাবে দুই হস্ত জামুদেশে বিলম্বিত করিয়া হেটমুণ্ডে সজল
নয়নে বিষম বদনে পণ্ডিত মহাশয়ের ভীম মুষ্টির সম্মুখে কম্পিত
কঁদয়ে আসিয়া দাঁড়াইতেন,—কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এক্ষণে
তিনি ঐচ্ছান আমলের গুরু নিকট হইতে বহু দূরে প্রয়াণ
করিয়াছিলেন,—নিকটে থাকিলে কি হইত বলা যায় না! কে
পশ্চাৎ হইতে বলিল, “পণ্ডিত মশায়, কি খুঁজিতেছেন?”

বৃদ্ধ নীচু হইয়া মস্তক অবনত করিয়া এক আসসেওড়া গাছের
ঝোপের মধ্যে প্রিয় শিশুর অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন ;—সহসা
পশ্চাতে কে এই কথা বলায়, তিনি একেবারে লক্ষ দিয়া উঠিয়া
দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হৃদয়ে সাহসের ভাগ কোন কালেই
প্রচুর পরিমাণে ছিল না,—ভগবান্ এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-
দিগকে জগতের এই পরম বস্তু হইতে বহুকাল বঞ্চিত রাখিয়াছেন।

বুদ্ধ ব্রাহ্মণ বিশ্বয়ে দেখিলেন,—স্বয়ং জমিদারপুত্র ললিত-প্রকাশ তাঁহার বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত ! তাঁহার সঙ্গে একটি সমবয়স্ক যুগল,—পশ্চাতে দূরে বহু লোক জন । বুদ্ধ হস্তে হস্ত বর্দ্ধন করিতে করিতে সহাস্ত বয়ানে বলিলেন, “এস বাবা,—আমার পরম সৌভাগ্য,—গরীবের কুঁড়ে !”

এবস্থিৎ বুলি ললিতপ্রকাশ সার্কর্ভৌম মহাশয়ের মুখে অনেকবার শুনিয়াছেন,—সুতরাং তিনি তাঁহার কথায় কান না দিয়া হাসিয়া বলিলেন, “পণ্ডিত মহাশয়, ধোপের ভিতর কি খুঁজিতেছিলেন ! ছাগল হারাইয়াছে নাকি ?”

বুদ্ধ বলিলেন,—“চেহারায় নহে,—বুদ্ধিতে বটে ।”

ললিতপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন,—“সে কি রকম ?”

সার্কর্ভৌম মহাশয় বলিলেন,—“আমার একটি ছাত্র আজ আমার এখানে আসিয়াছে,—বড় লোকের ছেলে,—ছুটামিতে পুঁপুঁক,—এখনও বিন্দুমাত্র তাহার চরিত্রের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই ।”

ললিতপ্রকাশ বলিলেন, “ভারি অশ্রায়তো ! এখন এই আপনার সংছাত্রটি হঠাৎ লুকাইলেন কেন ?”

ব্রাহ্মণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “ছুটামি—কেবল ছুটামি ! আমার নাতিনৌ পত্রলেখা বলিতেছে,—সে আমার উৎকৃষ্ট গরদের ঘুতি, উড়ানী ও আমার হাতীর দাঁতের ষড়ম লইয়া লম্বা দিয়াছে ! না,—নিশির এতদূর অংপতন হইতে পারে না !”

লক্ষী-সাত

ষতীন অতি বিশ্বয়ে বলিয়া উঠিলেন,—“নিশি! নিশি
আপনার এখানে এসেছিল! সে আপনার ছাত্র! সে কোথায়
গেল?”

ষতীনের উদ্বেগপূর্ণ চকল ভাব দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিস্মিত
ভাবে তাঁহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। ললিত-
প্রকাশ বলিলেন, “আমরা তো তাঁকেই খুঁজিতেছি।”

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“তোমরাও খুঁজিতেছ?—কেন?”

ললিতপ্রকাশ বলিলেন,—“আপনি তাঁহাকে কোথায়
পেলেন?”

সার্বভৌম মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, “কোথায় পেলেন। সে
আমার বহু কালের ছাত্র। আমার কাছেই তার হাতে খড়ি।
ঐ দিকে চরিত্র ভাল,—কখন বার্ষিক দিবস সন্ধ্যা কোন গোল
করে য়।—পরসাওয়ালা লোকের ছেলে,—তবে ছুটানি,—
এখনও তার বিশ্বাস্য ছাত্র হ্রাস হয় নাই।”

ললিতপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন, “আপনি তাঁহাকে কোথায়
পাইলেন?”

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“কোথায় পাইলাম! দীর্ঘের পাড়ে
পাইলাম! আমার আদমোনি রোহিতটা গোল করিয়া
দিয়াছে! সে পেছনে দাঁড়াইয়া ছিল, দেখিতে পাই নাই;—টান
মারিয়া মাছটা খোওয়াইলাম,—আর বেগ্নিকের উপর গিয়া
পড়িলাম!”

ললিতপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন, “তাই লোকে বলিতেছে, পণ্ডিত মহাশয়—আপনি একটু কাহায়াটি মাখিয়া ছিলেন।”

সার্করভৌম মহাশয় বলিলেন, “তা,—তা,—পত্রলেখ্যও ঐরূপ গ্রলিতোঁছিল।”

“এখন আপনার ছাত্র কোথায় গেলেন?”

“তাহাই খুঁজিতেছি।”

“আমুন,—আমরাও দেখি। আমরাও তাঁহাকে খুঁজিতেছি—ইনি যতীনবাবু,—আমার বিশেষ বন্ধু,—নিশিবাবু ইঁহার বন্ধু,—ইঁহার সহিত আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছেন।”

“আর আমায় এ কথার বিন্দু বিশ্বর্গও বলে নাই। গাধার টুপি—”

“পণ্ডিত মহাশয়,—সে বয়স কি আর আছে?”

“চিরকাল থাকে,—গাধাও কখনও যায় না।”

ললিতপ্রকাশ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, যতীনও হাসিয়া ফেলিলেন। খামখেয়ালী নিশিবাবু গুরুর এই স্মললিত প্রহংসা বাক্য শ্রবণ করিলে কত দূর আনন্দ উপলব্ধি করিতেন বলা যায় না।

ললিতবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আপনার বিশ্বাস যে আপনার ছাত্রটি এইখানে কোথায়ও লুকাইয়া আছেন?”

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“নিশি বাল্যকাল হইতে এইরূপ ছুঁটামিতে পূর্ণ। তাহার চরিত্রের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই।”

লক্ষ্মী-লাভ

“তবে দেখা যাক।” এই বলিয়া ললিতপ্রকাশ নিশি-
বাবুর অঙ্গসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন ;—তাঁহার লোকজনেরা লাঠি
সোটা লইয়া চারিদিকস্থ ঝোপ সকল বিপর্য্যস্থ করিয়া তুলিল,
—চারিদিকে একটা হৈ হৈ ব্যাপার পড়িয়া গেল। গ্রাম্য
কৃষক, জোলা, মালা, কৈবর্ত, বান্দিগণ, সকলে ক্ষীপ্র হস্তে
ডাল ভাত গরাস গরাস শেষ করিয়া, যে যাহার গৃহ হইতে
ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। কৃষকবধূগণ উদ্গ্রীব ভাবে
গৃহের বাহিরে আসিয়া ব্যাপার কি অবগত হইবার জন্য
উৎসুখ চিন্তে চাহিতে লাগিল। উলঙ্গ বালকগণ খেলা
খুলা ফেলিয়া ছুটিল,—চারিদিকে রীতিমত নিশিবাবুর শিকার
আরম্ভ হইল,—কিন্তু কোথায়ও নিশিবাবু নাই,—তিনি সম্পূর্ণ
অদৃশ্য হইয়াছেন।

বৈভব ও ললিতপ্রকাশ উভয়েই বিস্মিত হইয়া পরস্পরের
মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। নিশি সহসা কোথায় নিরুদ্দেশ
হইয়া গেল! বুদ্ধ শিক্ষককে বহুদিন পরে দেখিয়া, তিনি যে
তাঁহার বাড়ী আসিবেন, তাহাতে বিশ্বাসের কিছু নাই,—বিশে-
ষত, বতীনের প্রত্যাগত হইতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল ;—এ অব-
স্থায় অস্থিরপক্ষম নিশিবাবু যে সহসা প্রাচীন আমলের পণ্ডিত
মহাশয়কে পাইয়া তাঁহার শরণাগত হইবেন—তাহাতে আশ্চর্য্য
কি! কিন্তু আবার এরূপে নিরুদ্দেশ হইবার কারণ কি!

বতীন ও ললিত উভয়েই মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে

ছিলেন। বৃদ্ধ সার্বভৌম মহাশয় ক্রমে বিরক্তিতে ও ক্রোধে ব্রহ্মণ্যতেজে উদ্দীপ্তমান হইয়া উঠিতেছিলেন। এ সময়ে নিশিবাবু তাঁহার সম্মুখে পতিত হইলে কান মলা হইতে কিছুতেই ব্রহ্মা পাইতেন না,—দুই কর্ণ লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া বাইত।

এই সময়ে একজন পাইক ছুটিয়া আসিয়া সসম্মানে সেলাম দিয়া বলিল,—“কর্তা তলব দিয়াছেন,—গুরু ঠাকুর মহাশয় আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছেন।”

এখন কি করা কর্তব্য। ললিতপ্রকাশ বহুর দিকে চাহিলেন। যতীন বলিলেন,—“ভাই, ভূমি বাড়ী ফিরিয়া বাও, আমি নিশির সঙ্গান করিয়া এখনই ফিরিব,—সে এইখানেই কোন খানে আছে,—কোথায় বাইবে!”

ললিত বলিলেন,—“আমারও তাড়াতাড়ি নাই ;—দুইজন এক সঙ্গে ফিরিব। গ্রামের কেহ না কেহ তাঁহাকে দিচ্চরই দেখিয়াছে!”

এই সময়ে ঘুরে বালকঠে ধ্বনিত হইল, বায়ুনকাকা—বায়ুনকাকা—গোবর বেখেছে। সে পাক্কী চড়ে গেছে।”

সকলে দেখিলেন, এক উলঙ্গ বালক ব্রহ্মাস্তুরাল হইতে সুর লয়ে নানা ভঙ্গিতে ১ ত স্বরে বায়ুন কাকাকে খেগাইতে চেষ্টা পাইতেছে ;—দুইজন পাইক ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে গেলে, সে উচ্চ হাস্তে চারিদিক্ বালমূলভ প্রফুল্লভায় পূর্ণ করিয়া, উর্দ্ধ্বাঙ্গে ছুটিয়া পলাইল,—কেহ তাহাকে ধরিতে পারিল না।

লক্ষী-লাভ

সার্কর্ভৌম মহাশয় গভীরভাবে বলিলেন,—“এই পঞ্চানন দাদার অপোগণ্ড ছেলেটা গর্ভস্রাব হইতেছে।”

ললিত ও স্বতীন উভয়েই কষ্টে হাস্তাবেগ সঞ্চরণ করিয়া মুখ অন্ধ দিকে ফিরাইলেন। একটু আত্মসংযম করিয়া ললিতপ্রকাশ বলিলেন, “খোকা বলিতেছে,—পাক্কী চড়ে গেছে,—হয়তো নিশিবাবুকে সে পাক্কী করিয়া বাইতে দেখিয়াছে।”

স্বতীন বলিলেন,—“পাক্কী করিয়া কোথায় বাইবে?”

ললিত বলিলেন,—“সন্ধান করিলে এখনই তাহা জানিতে পারা বাইবে। আমাদের মত ছোট গ্রামে পাক্কী সর্বদা চলা ফেরা করে না।”

এই সময়ে একজন বৃদ্ধ কৃষক আসিয়া জমিদারপুত্রকে অভিনন্দন করিয়া সসম্মানে বলিল,—“একজন গৌসাই ঠাকুর এই-খানে ঝেড়াইতে ছিলেন।”

সার্কর্ভৌম মহাশয় সবেগে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার কি কাপড় পরা ছিল?”

কৃষক বলিল,—“ভাল গরদের কাপড় চাদর,—পায় খড়ম।”

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—“সেই বটে। আর কেউ নয়, সেই বানর। কোথায় গেল?”

কৃষক বলিল, “রাজবাড়ীর পাক্কী এসে তাঁকে নিয়ে গেছে।”

সার্কর্ভৌম মহাশয় অতি বিস্ময়ে ভ্রাবহ ভাবে চক্ষু বিক্ষারিত

করিয়। বলিয়া উঠিলেন, “রাজবাড়ীর পাকীতে গেছে,—সে কি ?
কি একটা বিপদই না জানি ঘটাইল।”

ললিতপ্রকাশ আবার হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, “পণ্ডিত
মহাশয়, আজ এদেশে বড়ই ভুল চূকের প্রকোপ পড়িয়াছে।
আমাদের গুরুঠাকুর মহাশয়ের আজ আসিবার কথা ছিল,—
তাহাকে আনিবার জন্য পাকী স্টেশনে গিয়াছিল। বোধ হয়
বেহারারা ভুলক্রমে নিশিবাবুকে গুরুঠাকুর মহাশয় ভাবিয়া
পাকীতে লইয়া গিয়াছে।”

সার্কভোম মহাশয় অতি রাগত স্বরে বলিলেন,—“আর সেই
মুখটা কোন কথা না কহিয়া পাকী চড়িয়া গেল। সর্বত্র সর্ব
সঙ্গে কোহুক। আমার আনমনী রোহিতটা নষ্ট করিল। আবার
এই কাণ্ড। কর্তৃপক্ষনিলে আর রক্ষা রাবিলেন না।”

কর্তার কথা উদ্ধিত হওয়ায় ললিতপ্রকাশও একটু অসন্তুষ্ট
হইলেন। যদি নিশিবাবু স্বার্থই এ কোহুক করিয়া গুরু
সাক্ষিয়া গিয়া থাকেন, তবে তাহার পিতা নিতান্তই রাগত ও
বিরক্ত হইবেন। শিক্ষিত বুদ্ধিমান নিশিবাবু কি কখন এরূপ
তথ্যবহ কোহুক কথিতে পারেন ! তাহাদের আত্মীয় স্বজনদিগের
কুল-ললনাগণ নিঃসঙ্কোচে গুরুঠাকুর মহাশয়ের সম্মুখে বাহির
হইবে ? এরূপ অবস্থায় কেহ কি কখন ভ্রমলোকের অন্তঃপুর মধ্যে
প্রবেশ করিতে পারে ?—অসম্ভব। ললিত প্রকাশ সত্যই একটু
বিচলিত হইয়া পড়িলেন,—তিনি যতীনের দিকে ফিরিয়া

অম্মী-লাভ

মুহুরে বলিলেন,—“নিশিবাবু কি বার্থই এরূপ কোড়ক করিবেন ?”

যতীন জানিডেন নিশির অসাধ্য কিছু নাই, নিশির দ্বারা সকলই সম্ভব। তিনি মনে মনে বুঝিলেন, নিশি ংকটা ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটাইয়াছে,—প্রকাশে বলিলেন,—“ভাই, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না,—এখানে আসিয়া সকলই অদ্ভুত দেখিতেছি!”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর-বাড়ী

চৌধুরী মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ী একটা বিস্তৃত ব্যাপার ! তাঁহার বিস্তৃত গ্রামসম অট্টালিকার বাহিরে—দক্ষিণ প্রান্তে,—এই বৃহৎ ঠাকুর-বাড়ী। কত শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম, হেমন্ত, ইহার উপর দিয়া অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সম্মুখেই দোলমঞ্চ,—ইষ্টক নিৰ্ম্মিত, স্তরে স্তরে, থাকে থাকে উঠিয়া, উপরে সুন্দর গম্বুজে অবশেষ হইয়াছে। প্রাচীন আমলের শিল্পিগণ মনের সাধে নানা কারুকার্যে সমস্ত মন্দিরটী আবরিত করিয়াছে। সেই সকল চিত্রবিচিত্র কারুকার্যের উল্লেখে আধুনিক অধঃপতিত শিল্পিগণ নানা রং বেরং লেপিত 'করিয়া দোলমঞ্চের অপক্লপ শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। দোলের দিন এই অভূতপূর্ব শোভা লাল নীল সালুর নিশানে ও ঝালরে ও নানা রং বেরঙ্গের বেললগ্ননের আলোকে, আরও অপক্লপ শোভা ধারণ করিয়া থাকে।

পার্শ্বে নহবতখানা ;—চারিটা অতি দীর্ঘ তাল বৃক্ষের সুগোল ছল দণ্ডের উপর বহু উচ্চে ক্ষুদ্র চালবিশিষ্ট চারিদিক্ উন্মুক্ত নহবত খানা,—এখন ইহার হতশ্রদ্ধেয়,—হতাদরিত হীণ অবস্থা, কিন্তু পূজা পার্বণে নানা রঙের বস্ত্রে, নিশানে, বেল-লগ্ননে, ইহার

লক্ষ্মী-লাভ

অল্প বৃত্তি সংবাটিত হইয়া পড়ে ;—তখন সেই বাহারের ভিতর অতি মধুরে ধাওয়া, ইমনকল্যাণ প্রভৃতি নানাবিধ রাগিনী আলাপ হইতে থাকে ।

ঠাকুর-বাড়ীর দ্বারে দুইটী বৃহৎ শিব মন্দির । শিব দুইটীও প্রকাণ্ড কাল মন্দির মূর্তিতে শোভমান,—মস্তক উপরে দৃষ্ট চন্দন ও সূলের অবশিষ্টাংশ সর্বদাই পরিলক্ষিত হয় । মন্দিরের পশ্চাতে সুন্দর নাট-মন্দির,—নাট-মন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ মন্দিরে করালবদনী মায়ের পাষণ্ড মূর্তি,—নানা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা,—অতি সুন্দর—অতি মনোহর । দূরে একটি সুন্দর অট্টালিকায় অষ্ট-ধাতু-নির্মিত রাধামাধব,—চৌধুরী মহাশয়দিগের বংশ পরম্পরায় কুল-দেবতা !

চারিদিকে বিস্তৃত সুমঙ্গল অতি পরিষ্কার প্রাক্ষণ,—অতি সুন্দর সুন্দর উদ্যান পরিবেষ্টিত । লাল জবা, বৃহৎ স্থলপদ্ম,—করবী, জাতি, জুঁতি, মল্লিকা, সর্বদাই প্রস্ফুটিত হইয়া অতি সুন্দর শোভা বিস্তার করিতেছে । ইষ্টকমন্ডে পরিবেষ্টিত বৃহৎ বেলা ও ক্ষুদ্র তুলসী বৃক্ষেরও অভাব নাই ।

এক পার্শ্বে বিস্তৃত অতিথিশালা ও পাকশালা,—চৌধুরী মহাশয়ের দ্বারে আসিয়া কেহ কখনও অভুক্ত প্রত্যাবর্তিত হইত ; না । প্রত্যহই ঠাকুর-বাড়ীতে বহু নর নারী আহাৰ্য্য পাইত । ঠাকুরের যে বিস্তৃত দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল, তাহাতে প্রত্যহ শত লোকের রাজভোগের আয়োজন হইত ।

ঠাকুর-বাড়ী

ঠাকুর-বাড়ীর সুন্দর উদ্যান মধ্যে একটা সুন্দর অট্টালিকা ছিল ;—গুরুঠাকুর প্রভৃতি মাননীয় কেহ আগমন করিলে, এই বাড়ীতেই তাঁহার বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইত,—আজ নিশিবাবু মহা সমাদরে এই অট্টালিকায় নীত হইয়াছেন।

সুন্দর গালিচায় তিনি উপবিষ্ট ;—চারিদিকেই বহুলোকের সমাগম। ঠাকুর-বাড়ীর চারিদিকে লোক ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি করিতেছে,—একটা মহামারি ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। জমিদারদের গুরুঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া, চৌধুরী মহাশয়ের জ্ঞাতি কুটুম্ব ললনাগণ অবগুণ্ঠনে বদনারত করিয়া ঠাকুর-বাড়ী অভিমুখে বাস্তব সমস্তে ছুটিয়া আসিয়াছেন। গৃহ পার্শ্ব, ছাদ, গবাক্ষ, দ্বারান্তরাল হইতে তাঁহারা উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন। দূর হইতে গললয় বস্ত্রে সকলে গুরুঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। বাহিরে লোকজনেরা কিস্কিন্দ, করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বলিতেছে,—“ছোকরা।”

নিশিবাবু অবিচলিত ! তিনি নীরবে বসিয়া মনে মনে গবেষণা করিতেছেন, “গুরুগিরি কখনও কখন হয় নাই,—এ ব্যবসায়ের পর্যায় সকল আদৌ অভ্যস্ত নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের কল্যাণে বেশ সম্বন্ধে কোন ক্রটি লক্ষিত হইতেছে না,—তবে বুলি আয়ত্ত নাই,—এ ঘোর সঙ্কটে নীরব বাক্যহীন থাকাই বুদ্ধমানের কার্য্য।”

অস্ত্রে হইলে কি করিত বলা যায় না। এই এত বড় জন্ম-

লক্ষ্মী-সাত

দার বাড়ীতে, এই ভয়াবহ কৌতুক করিলে, তাহার উপসংহারে পৃষ্ঠে চন্দ্রপাদুকার বেকুপ সমাদর সংঘটিত হইবে,—ব্রাহ্মণ বলিয়া ক্ষমা হইবে না,—যতীন তাহার বন্ধু ললিতকে দিয়াও বৃদ্ধ প্রবীণ চৌধুরী মহাশয়ের ক্রোধ উপশমিত করিতে পারিবে না,—এই সকল ভয়াবহ কথা তাঁহার চির-প্রশান্ত হৃদয়ে একবারও সমুদিত হইতেছে না! নিশিবাবু অবিচলিত।

চৌধুরী মহাশয়ের গৃহিণী, কত্না স্ত্রীবালাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং গুরুঠাকুর মহাশয়ের অভ্যর্থনায় আসিয়াছেন। তাঁহার ত্রায় গৃহিণী আর দ্বিতীয় ছিল না; চৌধুরী মহাশয় গৃহকার্য কিছুই কখনও দেখিতেন না,—দেখিবার আবশ্যকও হইত না। চৌধুরী-গৃহিণী এই বৃহৎ পুরীর সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। এই অসংখ্য লোকের অহারাদি তিনি স্বয়ং সমস্ত আয়োজন করিতেন,—সকলকে আহার করাইয়া, গরু বাছুর প্রভৃতির আহার পর্য্যন্ত স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়া, অপরাহ্নে নিজে সর্বশেষে আত্মারে বসিতেন। তাঁহাকে সকলে জমিদার বাড়ীর জীবন্ত মুষ্টিমতী লক্ষ্মী বলিয়া জানিত। তাঁহারই গুণে কখনও এই বৃহৎ সংসারে কলহ, দন্দ, অশান্তি, গোলযোগ ঘটিতে পারিত না;—একুপ শান্তিময় সুখের পরিবার আর দ্বিতীয় ছিল না। সকলেই তাঁহাকে “মা” বলিয়া ডাকিত;—প্রকৃতই তিনি চৌধুরী মহাশয়ের সংসারের,—চৌধুরী মহাশয়ের বিস্তৃত জমিদারির,—“মা” ছিলেন। তাঁহার দয়া,—তাঁহার দাক্ষিণ্য,—তাঁহার সদাসয়তা,—তাঁহার মমতা,—তাঁহার



“করেন কি ! করেন কি !”

(দশম অঙ্ক - ৯)

ঠাকুর-বাড়ী

পা' বজ্রতা,—তাঁহার নিষ্ঠাবানতা,—তাঁহার দেব দ্বিজে ভক্তি,—
প্রকৃতই দৃষ্টান্তস্থল ছিল। এ প্রদেশে গৃহিণীর কথা উঠিলে,
সকলেই তাঁহার নাম উল্লেখ করিত,—তাঁহার নামে সকলের
হৃদয়ে পুলকে পূর্ণ হইত। দেশ বিদেশ হইতে বিপন্নগণ তাঁহার
নিকট ছুটিয়া আসিত। কাহারও কোথায়ও গৃহ বিবাদ ঘটিলে,
তিনিই তাহার মধ্যস্থতা করিয়া, অচিরে সে সংসারে শান্তিস্থা
নিষ্কিপ্ত করিয়া দিতেন।

কত্থা সুবালাও “মায়ের মেয়ে” হইয়াছেন। তাঁহাকে সকলে
“রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী” বলিত। চৌধুরী-গৃহিণী কষ্টে
রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে পারিতেন,—কিন্তু কত্থা, ললিত-
বাবুর যত্নে, ইংরাজি পর্য্যন্ত শিখিয়াছেন,—চিত্র কার্যে অতি
সুদক্ষ হইবাছেন,—শিল্পকার্যে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ সে
প্রদেশে ছিল না,—এতদ্ব্যতীত রন্ধনে তিনি সিদ্ধহস্তা!

তবে তিনি জমিদার কত্থা,—পত্রলেখা দরিদ্র সার্কসভৌষ
মহাশয়ের দৌহিত্রী,—সুতরাং তাঁহার পার্শ্বে পত্রলেখার রূপ গুণ
কতকটা মেঘাবরিত পূর্ণ চন্দের জায় হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু
সুবালা জানিত যে পত্রলেখা তাহাপেক্ষা সুন্দরী! সর্বদা
তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সে যাহা শিখিয়াছে,—পত্রলেখাও
তাহাই শিক্ষা করিয়াছে,—সৰ্ক বিষয়েই পত্রলেখা তাহাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠা,—বিশেষতঃ রন্ধনে সে অদ্বিতীয়া। ইহাতে কখনও এক
বুদ্ধবৃদ্ধের জ্ঞানও সুবালা রিষপরতজ্ঞা হইত না,—সে প্রাণের সহিত

লক্ষ্মী-লাভ

পত্রলেখাকে ভাল বাসিত; তাহাকে একদিন না দেখিলে ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

চৌধুরী-গৃহিণী প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া পূজাদি সমাপন করিয়া গৃহকার্যে নিযুক্ত হইতেন;—এক্ষণে শুদ্ধ পবিত্রমনা হইয়া লাল বারাগসা সাড়ীতে-ভূষিতা অঙ্গে ঠাকুর মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। কত্কাও লাল বহনুলোর একখানি বারাগসা পরিয়াছেন। চৌধুরী-গৃহিণী অলঙ্কারের প্রতি আদৌ আকৃষ্টা ছিলেন না,—মোটা স্বর্ণ বালা ও মোটা গোটহার ব্যতীত আর কেহ কখনও তাঁহাকে অস্ত্র কোন অলঙ্কার ব্যবহার করিতে দেখে নাই,—কিন্তু কত্কাকে তিনি নানা সুন্দর অলঙ্কারে সুশোভিতা করিয়াছিলেন,—স্বতই সুবালাকে দুর্গা প্রতিমার দ্বায় দেখাইতেছিল!

নিশিবাবু জননী ও কত্কাকে দেখিয়া বিস্মিত, মুগ্ধ ও স্তম্ভিত-প্রায় হইলেন। ইনিই যে ললিতপ্রকাশের জননী আর ইনিই যে ললিতপ্রকাশের ভগিনী,—ইহা বুঝিবার বুদ্ধি তাঁহার স্মৃতিক্ত মস্তিষ্কে বধেই ছিল। ইহাদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ও আবশ্যক,—এ সম্বন্ধে গুরুগির্বির প্রথা কি,—তাঁহার আইন-প্রণীড়িত মস্তিষ্কে তাহা প্রবেশাধিকার পাইল না,—তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

চৌধুরী-গৃহিণীও তাঁহাকে দেখিয়া একটু চিন্তিত হইয়া ইতস্ততঃ ভাবে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহাদের গুরুঠাকুর মহাশয়

ঠাকুর-বাড়ী

যে অন্নবয়স্ক, তাহা তিনি জানিতেন, —পুরাতন প্রাচীন গুরুঠাকুর মহাশয় দুষ্কপোষ্য বালক রাখিয়া গৃহ্যযুগে পতিত হইয়াছিলেন; —সেই পর্য্যন্ত এই বিশ বৎসর আর তাঁহাদের গৃহে গুরুঠাকুর মহাশয়ের পদার্পণ ঘটে নাই, —সুতরাং গুরুঠাকুর মহাশয় যে অন্নবয়স্ক যুবক, তাহা তিনি জানিতেন,—তবুও নিশিবাবুকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। কিন্তু পরযুক্তর্থেই তিনি গল-লগ্ন-কৃতবাসে গুরুঠাকুর মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন,—কত্নাও জননীর অহুশরণ করিল।

নিশিবাবু একেবারে লক্ষ দিয়া উঠিয়া বলিলেন,—“করেন কি! করেন কি!”

চতু পরিচ্ছেদ

জুয়াচোর

সকলে বিস্মিত,—স্তম্ভিত। চৌধুরী-গৃহিণীও অতি বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গুরুঠাকুর মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গুরুঠাকুর মহাশয়ের অভূতপূর্ব ভাব—তাহার বিস্ফারিত চক্ষু,—প্রসাবিত হস্ত,—অর্ধ বহিস্কৃত জিহ্বা দেখিয়া, সুবালা অতি কষ্টে তাহার সুন্দর রক্তিমাত গুঠ গুঠে পেষিত করিয়া হাস্ত সম্বরণ করিল, কিন্তু তাহার মুখ এক অপক্লপ সৌন্দর্য্যে বিভাসিত হইয়া গেল।

এই সময়ে পত্রলেখা তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। সে গুরুঠাকুরকে দেখিয়া বিস্ময়ে প্রায় অর্ধশুট নিনাদ করিয়া উঠিল। নিশিবাবুরও শেষ দশা অচিরে উপস্থিত হইল;—তিনি ধপ করিয়া সহসা কর্জিত কদলিযুদ্ধের জ্বায় গালিচার উপর বসিয়া পড়িলেন। তাহার মস্তক সবলে ভূমির দিকে প্রবল বেগে আনুষ্ঠ হইয়া পড়িল,—তিনি ভূমির দিকে সবলে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,—মস্তকের উর্দ্ধ উদ্ভিত শক্তি অচিরে বিলীন হইয়া গেল।

পত্রলেখা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার অতি বিস্ময়-পূর্ণ মুখ দেখিয়া সুবালা বিস্ফারিত নয়নে তাহার মুখের দিকে

জুয়াচোর

চাহিয়া রহিল। চৌধুরী-গৃহিণী একবার পত্রলেখার মুখের দিকে,
—একবার কন্ঠার মুখের দিকে চাহিলেন,—তৎপরে ঈষৎ ক্রকুটী
করিলেন;—কন্ঠাও পত্রলেখার দিকে রোষকষায়িত লোচনে
চাহিলেন। পত্রলেখা সুবালার হাত ধরিয়া টানিল,—তাহাকে
একটু দূরে লইয়া গিয়া কানে কানে বলিল,—“জুয়াচোর।”

সুবাল। প্রায় উচ্চ স্বরে বলিয়া ফেলিয়াছিল, “জুয়াচোর—সে
কি।”

কিন্তু সে অতিকণ্ঠে আত্মসংযম করিল,—ব্যাপার কি
জানিবার জ্ঞান পত্রলেখাকে লইয়া পার্শ্বের গৃহে পলাইল,—চৌধুরী-
গৃহিণী আবার ক্রকুটী করিলেন।

দূরে দূরে থাকিয়া গ্রাম্যললনাগণ এই সকল লক্ষ্য করিতে-
ছিলেন,—তাহারাও বিস্মিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের
দিকে চাহিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন যে, একটা কি
গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে,—কিন্তু কি ঘটিয়াছে, তাহা কেহই
বুঝিতে পারিলেন না।

নিশিবাবু নীরব, নিশ্চন্দ। তাঁহার ভাব দেখিয়া চৌধুরী-
গৃহিণী বিশ্বস্তের উপর বিশেষ বিস্মিত হইতেছিলেন,—বলিলেন,
“আপনার কি অনুধ করিতেছে?”

হেট মুণ্ডে আঙুল কণ্ঠে হতভাগ্য নিশিবাবু কেবলমাত্র বলি-
লেন,—“আজ্ঞে না।”

এই সময়ে কন্ঠা ডাকিল, “না।”

লক্ষ্মী-লাভ

চৌধুরী-গৃহিণীও কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িতে ছিলেন ;—
গুরুঠাকুর মহাশয়ের অভূতপূৰ্ণ ভাবে, তিনি কি করা উচিত,
তাহা স্থির করিতে পারিলেন না,—কন্ডার আস্থানে ধীরে ধীরে
পার্শ্বের গৃহে প্রস্থান করিলেন ।

তখন নিশিবাবু মস্তক উত্তোলিত করিয়া নিমিষের জন্য
চোরের ভ্রায় চারিদিকে চাহিলেন । পত্রলেখা আসিয়া তাঁহার
স্বস্তান্ত যে তাহার প্রিয় সখীর নিকট রং চড়াইয়া বর্ণিত করিয়াছে,
তাহা বুঝিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব হইল না । এখনই
সেই অত্যাম্ভব্য বিবরণ যে চৌধুরী-গৃহিণীর কর্ণকুহর পরিভ্রম
করিবে, তাহাও উপলব্ধি করিতে তাঁহার অধিক ক্লেশ পাইতে
হইল না । “অগভভেকার” যে চূড়ান্ত হইয়া শেব সীমায় উপনীত
হইয়াছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিলেন । এক্ষণে লম্বা দেওয়া
ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই ; কিন্তু পট্ট বস্ত্রে খড়ম পায়ে লম্বা-
দেওয়া-কার্যে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না ;—বিশেষতঃ এই শত্রুপুত্রী
বহু কালো কালো দীর্ঘ লাঠিয়ালে পরিপূর্ণ । এখন হইতে লম্বা
দিবার চেঁচায় চেঁচতিবান্ হইলে, গোবর্ডেন হওয়াই তাহার এক-
মাত্র কল ; স্মৃতরাং নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া স্থির থাকাই
একমাত্র যুক্তি,—এবমিধ গবেষণা করিয়া নিশিবাবু উদ্ভ্রাণ-
ক্লমে গুরুলীলার উপসংহার ভাগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।
তিনি লেন, পার্শ্ববর্তী গৃহে চৌধুরী-গৃহিণী বসিতেছেন,—“পাগল
আর কি !”

জুয়াচোর

পত্রলেখা মুহূর্তে বলিতেছে, “দাদার কাপড় এখনও পরে আছে।”

নিশিবাবু মনে মনে বলিলেন, “এই ছুঁড়োর পলা টিপিয়া শেব কি একটা নরহত্যা পাপে পাকী হইতে হইবে।”

এই সময়ে ব্যস্ত সমস্ত হাট সার্কুভৌম মহাশয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপশ্চাতে ললিত ও বতীন,—তৎপশ্চাতে প্রায় সমস্ত গ্রামবাসী। সকলে নিশিকে উপবিষ্ট দেখিয়া ভক্তিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সার্কুভৌম মহাশয় পুরাকালের ভয়াবহ পণ্ডিত মূর্তি ধারণ করিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “নিশি,—বাপু,—তোমার চরিত্র বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই।”

নিশিবাবু বিনীত স্বরে বলিলেন, “কেন, পণ্ডিত মহাশয়?”

বতীনের মুখ রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছিল। নিশি চিরকালই কোড়ুকপ্রিয়,—কিন্তু অপরিচিত স্থানে একপ ভয়াবহ কোড়ুক করা কি উচিত? বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয় কি ভাবিবেন! ললিত কি মনে করিবে! তাঁহার মাথা কাটা গেল,—বতীন প্রকৃতই নরমে মরিয়া গেলেন!

কিন্তু ললিতপ্রকাশ মুহূর্তে হাসিতে ছিলেন। নিশিবাবুর অপরাধ বেশ,—সার্কুভৌম মহাশয়ের ক্রুদ্ধ মূর্তি,—ইহা লক্ষ্য করিলে হাস্ত সঞ্চরণ দ্রুত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নিশির “কেন” শুনিয়া সার্কুভৌম মহাশয় তেলে বেঙনে

লক্ষ্মী-লাভ

অলিয়া উঠিলেন। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠস্বর রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, “কে—কে—ন! এই—এই—কো—কো—তুক করবার—স—সময়!”

নিশিবাবু অবিচলিত ভাবে বলিলেন, “পণ্ডিত মহাশয় কোতুক বুঝিলেন কিসে?”

সার্বভৌম মহাশয় রাগে কাঁপিতেছিলেন,—বলিলেন, “কর্তা শুনলে রক্ষা রাখবেন না! উঠে আয় বানর।”

নিশিবাবু বলিলেন,—“এই বোধ হয় কর্তাই আসছেন!”

এই সময়ে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার চিরপারিষদ বুদ্ধ জনার্দন শর্ম্মার সহিত তথায় অলিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুগৃহে বুদ্ধ জনার্দন শর্মা প্রতি বৎসর একবার করিয়া গিয়া গুরু দক্ষিণা দিয়া আসিতেন। গুরুর প্রাপ্য সমস্তই চৌধুরী মহাশয় বৎসরে বৎসরে জনার্দন শর্ম্মার মারফত প্রেরণ করিতেন,—সে বিষয়ে তাঁহার কোন ক্রটি ছিল না,—সুতরাং নূতন গুরুকে কেবল জনার্দন শর্ম্মাই চিনিতেন। তিনি নিশিবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, “এই যে ভায়া এসেছে! আমরাতো মনে করেছিলাম, তোমার পদধূলি এ বাড়ীতে বুঝি আর পড়'ল না।”

এই কথায় সকলে স্তম্ভিত! বামহস্তে সবলে কটা বস্ত্র চাপিয়া ধরিয়া সার্বভৌম মহাশয়কে সর্বসমক্ষে বাণ্যাবহা হইতে আশ্বরক্ষা করিতে হইল। তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া,—হাঁ করিয়া স্তম্ভিত ভাবে,—দণ্ডায়মান রহিলেন। সকলেই অবাচ্,

জুয়াচোর

—বিস্মিত,—বতীন ঘূর্ণায়মান মস্তক ! তাঁহার বিবেচনাশক্তি
বিলুপ্ত । চৌধুরী মহাশয় ভক্তিভরে সম্মান সহকারে নিশিবাবুকে
প্রণাম করিলেন । নিশিবাবু বায় হস্ত প্রসারিত করিয়া অতি
পন্থীর ভাবে বলিলেন,—“জয়ন্ত !”

জনার্দন শর্মা উচ্চহাস্ত করিতে করিতে বলিলেন,—“ভায়া
ইংরাজি লেখাপড়ার পণ্ডিত হইয়াও দেখিতেছি, বাপ পিতামহের
ব্যবসা ভুল নাই । খুব ভাল—খুব ভাল—এই তো চাই !”

নিশিবাবু অতি মৃদু হাস্ত করিয়া বক্ষিমেনেত্রে পত্রলেখার
দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন,—সে দূরে যার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা
রহিয়াছে, তাহার মুখ লাল হইয়া চারিদিকে এক অপক্লপ শোভা
বিস্তার করিয়াছে । চৌধুরী-গৃহিণী বিস্মিতভাবে কর্তার দিকে
চাহিতেছেন,—সকলেই কৌতূহলপূর্ণ,—স্বার্থই কি নিশিবাবু
তাঁহাদের মাননীয় শ্রদ্ধের গুরুঠাকুর মহাশয় ? —না—তিনি কেবল
জাল,—কৌতুকশীল ঘূর্ত,—বদমাইস !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রহস্যভঙ্গ

চৌধুরী মহাশয়ের বিস্তৃত ঠাকুর-বাড়ীতে বহুলোক সমবেত হইয়া ছিল। পল্লিগ্রামের জমিদার কেহ কখনও একাকী অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হন না। বৈঠকখানায় নানা রক্তবেরঙ্গের বহুলোক,—তন্মধ্যে দীর্ঘ চৈতন, আলম্পরবশ, দেবোমোঙার সর্বনাশকারী, স্ত্রমস্ত্রণ, স্মৃগোলভুঁড়ি, রথীন্দ্রই অধিক। কাছারি বাড়ীতেও জমিদারের অভ্যাসে বহুলোকের ঠেলাঠেলি পড়িয়া যায়। তথায়, এদেশে, কচ্ছরী, বাবরিকাটা, লুঙ্গি পরিধান, টুপীধারী মিঞা সাহেবদের ভাগই অধিক দৃষ্টিপথে আসিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে স্কুলদেহ, তেলকুচুচে, মণ্ডল মহাশয়দিগকেও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যখন জমিদার বায়ুসেবনে বহির্গত হইলেন, তখন তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গভলিকাদলের তায় অসংখ্য লোক চলিতে থাকে—গ্রাম-মধ্যে একটা মহা সমারোহ পড়িয়া যায়;—গ্রাম্য ললনাগণ অবগুষ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া গৃহমধ্যে লুকাইতা হইলেন;—সুতরাং যেখানে চৌধুরী মহাশয়ের স্তভাগমন হইয়াছে, সেখানে যে একটা ক্ষুদ্র মেলায় লোক সমবেত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? চৌধুরী মহাশয়ের বিস্তৃত ঠাকুর-বাড়ী লোকে লোকারণ্য।

কিন্তু সকলই স্তম্ভিত,—বিস্মিত,—বিস্ফারিত ঋষি, সকলেই নিশিবাবুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন।

নিশিবা বু উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—পদাশ্রয়পর হইবার কোন উপায় নাই ! তিনি কিয়ৎক্ষণ মস্তক কণ্ঠ্যনে নিযুক্ত রহিলেন,—তৎপরে এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদানে প্রস্তুত হইয়া তাহারই আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন।

কমপক্ষে দুই শত ছোড়া চক্ষু তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ রশ্মি নিক্ষেপ করিতেছে;—বতীন হাঁ করিয়া দণ্ডায়মান,—মলিত হৃৎকম্প হৃদয় হস্তেছেন, কিন্তু নিশিবা বু অবনত মস্তক,—ভূমির সহিত তাঁহার নয়নসংস্পর্শের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা সংঘটিত হইয়াছে। অবশেষে অতি কষ্টে তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল,—তিনি তদবস্থায় হেটুগুণ্ড 'আরম্ভ করিলেন,—“আজ্ঞে—না—আমার বোধ হয়—হু এক কথা—বলা আবশ্যক। বতীন আমার বন্ধু,—এক যেসে ঋষি,—ললিতপ্রকাশবাবু তাহার বন্ধু;—সুতরাং জ্যামিতির হিসাবে আমারও বন্ধু।”

চৌহুদী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—“নিশ্চয়ই,—ইহাতে আমার আরও আনন্দ।”

জনার্দন শর্মা বলিলেন,—“তারা, এ সকল কথা আমাদের জানা আছে।”

নিশিবা বু পুনরায় মস্তক কণ্ঠ্যনপর হইয়া বলিলেন,—“আজ্ঞে—তা—নয়। বতীন একটু আশ্চর্যান্বিত হইয়াছে;—

ষতীন স্বধন তাহার বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আমার তাহার দেশে এই পথে হইয়া বাইবার জন্য অনুরোধ করে,—তখন আমি শিষ্যগৃহে বাইতেছি, জানিতাম না। হঠাৎ মনে পড়িল ;—তাহাই আপনাকে টেলিগ্রাম করিয়া ছিলাম ; ষতীনকে কিছু বলি নাই। তাহাকে একটু আশ্চর্য্যবিত্ত কারিবার ইচ্ছা ছিল। বোধ হয় এ কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছি।”

সার্কভোম মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—“অপগণ্ড বানর,—আমায় সংবাদ দিস্ নাই কেন ?”

নিশিবাবু বলিলেন,—“দোহাই পণ্ডিত মহাশয়,—আপনার যে এই গ্রামে বাড়ী, তাহা আমার মনে ছিল না।”

সার্কভোম মহাশয় অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—“তা আমি ভাল রকমই জানি ! তোকে পড়া মুখস্থ করাইতে আমার গলদ্বন্দ্ব হইত ! ভগবান্ তোকে স্বরণশক্তি কখনও দেন নাই।”

চৌধুরী মহাশয় মুদ্র হাসিলেন,—সকলই যুচকিয়া যুচকিয়া হাসিতে লাগিলেন,—প্রবোধ চৌধুরী মহাশয়ের সম্মুখে উচ্চ হাস্য করিতে কাহারও সাহস হইল না।

নিশিবাবু আরম্ভ করিলেন,—“দৌষির ধারে পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিয়া এই গ্রামে যে তাহার বাড়ী তাহা মনে পড়িল,—তাহার পর বাহা ঘটিয়াছে, তাহা পণ্ডিত মহাশয় জানেন।”

রহস্যভঙ্গ

পণ্ডিত মহাশয়ের বোধ হয় কর্জমাক্ত দেহের শুষ্ক চিত্র নয়নপথে পুনরুদ্ভিত হইল, তিনি কেবলমাত্র অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—“বানর !”

নিশিবাবু বলিলেন,—“তা—এখন বোধ হয়—পণ্ডিত মহাশয়ের কাপড় ছাড়িয়া দিতে আমি বাধ্য।”

তৎপরে স্বর একটু উচ্চে উত্তোলিত করিয়া দ্বারাস্তরালে দ্বণ্ডায়মানা পত্রলেখার দিকে বন্ধিমদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—“তবে জুয়াচোর নই !”

চৌধুরী মহাশয় সাগ্রহে বলিলেন,—“সে কি কথা। ইহাতে আমাদের সকলেবই স্বাধাচিৎ আনন্দ হইয়াছে।”

শর্মা বলিয়া উঠিলেন,—“কর্তা ঠিক কথা বলিয়াছেন ! ভায়া তুমি সাবাসিদে আসিলে, আমাদের এত আনন্দ হইত না।”

নিশিবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন,—“তাহা হইলে অমুমতি দিন,—আমি এখন হইতে সরিয়া পড়ি।”

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—“সে কি। তাও কি কখনও হয় !”

নিশিবাবু ছই হস্ত সবলে কচলায়নপরায়ণ হইয়া বলিলেন,—“গুরুগিরি অভ্যাহ নাই !”

শর্মা বলিলেন,—“ভায়া তুমি সব বিষয়ে পণ্ডিত,—তোমার কাছে কিছুই আটকাইবে না ! বিশেষতঃ সর ননী চব্যচুষ্য ষাওয়াই গুরুগিরির প্রধান অঙ্গ।”

লক্ষী-লাভ

এবার চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। সার্কর্ভোম মহাশয় বলিলেন,—“বানরটা ছেলে বেলা থেকেই তাতে খুব পোক্ত।”

এ মহা বিপদ হইতে উদ্ধারের পথ নিশিবাবু বিস্কু মাত্র কিছু তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াও আবিষ্কার করিতে পারিতেছিলেন না,—মনে মনে বলিতেছিলেন,—“ইচ্ছা করিয়া কি জঞ্জালই খটাইলাম ;—এখন উপায় !”

ভগবান্ উপায় মিলাইলেন। ললিতপ্রকাশ বলিলেন,—“বাবা, এখন সকলকার গুরুঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম হইয়া গিয়াছে। এখন আমি ইহাকে আমার বৈঠকখানায় লইয়া বাই। না হয় আহ্বারের সময় এইখানে আসিবেন।”

বিচক্ষণ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—“দে ভাল কথা,—তোমরা সব সময়বয়সী,—তাই বাও।”

“গুরুগিরি সম্বন্ধে আরও যদি কিছু করিবার থাকে,— তবে পণ্ডিত মহাশয় আছেন,—আমি তাঁর ছাত্র বইতো নই।” এই বলিয়া নিশিবাবু হাঁপ ছাড়িয়া দ্রুতপদে বতীন ও ললিতের নিকটস্থ হইলেন। খড়ম পায় দিয়া চলনশীল ব্যাপারে তিনি আদৌ অভ্যস্ত ছিলেন না। দুইবার ভূমিসাৎ হইতে হইতে রহিয়া গেলেন। সার্কর্ভোম মহাশয় আবার বলিলেন,—“বানর !”

নিশিবাবু ললিতের কানে কানে বলিলেন,—“ললিতবাবু,

খড়ম ভোড়া ছাড়তে হোল। জুতা দীঘির কাদায় বিশ্রাম লাভ কচ্ছে! শুধু পায় গেলে বোধ হয় আপত্তি হবে না।”

ললিতবাবু বলিলেন,—“সে কি। আমি এখনই চটি জুতা আনাইয়া দিতেছি।”

তিনি তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যকে জুতা আনিতে বলিলেন,—
সে উচ্ছ্বাসে ছুটিল। তিনি দুই তিনজন পাইককে নিশিবাবুর জুতার সন্ধানে পাঠাইলেন,—তাহারা দীঘির জলে জুতা শিকারে ধাবমান হইল।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—“আবার আহারের সময় দেখা হবে;—তবে আহারে একটু বেলা হবে। পত্রলেখা, শীঘ্র জল খাবারের আয়োজন কর,—এস শর্মা।”

তিনি ঠাকুর-বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, স্তূত্য বৃহৎ ছত্র মস্তকে ধরিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। অনেকেই জমিদারের অনুশরণ করিল,—কিন্তু অনেকেই রহিল। তাহারা বিস্মিত ভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিশিবাবুকে দেখিতে লাগিল।

নিশিবাবু আবার ললিতবাবুর কানে কানে বলিলেন,—
“এখান থেকে আপনার বৈটকখানায় বাইবার কি কোন গুপ্ত পথ নাহি?”

ললিতবাবু বিস্মিতভাবে বলিলেন,—“সে কি। কেন?”

নিশিবাবু বলিলেন,—“চিড়িয়াখানা হওয়া সহজ ব্যাপার নয়!”

লক্ষী-লাভ

ললিতবাবু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বতীন
এতক্ষণে অবাক হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন—এক্ষণে বলিলেন,—
“ভূমি অদ্ভুত লোক !”

নিশিবাবু বতীনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন,—
“আলিপুরের জু-বাগানের জিবাকের অবস্থা আমার হয়েছে।
দেখছেন না, সকলে কি রকম করে আমার দিকে চেয়ে আছে !
চলুন,—কোন গুপ্ত পথে সরে পড়ি।”

ললিতবাবু হাসিয়া বলিলেন,—“তাই আসুন ;—চলুন বাড়ীর
ভিতর দিয়া বাই। নিশিবাবু আমাদের গুরুঠাকুর মহাশয়,—
ওঁকে লজ্জা করিবান কেহ নাই। বতীন, ভূমি আর আমি দুজন
এক ;—এস এই পথে।”

বাইতে উদ্যত হইয়া ললিতবাবু বলিলেন; “মা, —বতীনের
ও নিশিবাবুর জল খাবার এখনই পত্রলেখা ও সুবালাকে দিয়া
আমার বৈঠকখানায় পাঠাইয়া দাও,—অনেক বেলা হয়েছে।”

কর্ত্তী ঠাকুরাণী বলিলেন,—“এখনই খাবার নিয়ে যাচ্ছে।
ভাতের একটু দেয়ী হবে—পত্রলেখা রান্ধিবে —”

নিশিবাবু মুস্তক কণ্ঠয়ন করিতে করিতে বলিলেন,—“তা তা
তাকে আর কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি ? বাড়ীতে নিশ্চয় ব্রাহ্মণই
রাধ্ছে।”

কর্ত্তী বলিলেন, “না—সেটা ভাল দেখায় না।”

“তবে বা হয় কর ;—সন্ধ্যা না হয় !” এই বলিয়া

ললিত, বতীন ও নিশিবাবুকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন। অনেক লোক তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে দেখিয়া ললিতপ্রকাশ তাহাদিগকে তাঁহাদের সঙ্গে আসিতে নিবেদন করিলেন,—তাহারা ধমকু খাইয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা তিনজনে তখন বাড়ীর পশ্চাৎ দিক দিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অন্দর

চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর,—তাহাতে ক্ষুদ্র খিড়কির দ্বার।
গেই দ্বারের পরেই সুপরিষ্কৃত জলপূর্ণ বিস্তৃত খিড়কির পুকুর।
তাহার পরেই চৌধুরী মহাশয়ের রন্ধনশালা,—সে এক বিস্তৃত
ব্যাপার। সারি সারি ঘর,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার,—এত কাল পূর্বে
নির্মিত যে ঘরগুলি প্রায় এক হস্ত পরিমাণ মৃত্তিকা নিয়ে আশ্রয়
লইয়াছে। বাগুকা বহুকাল প্রাচীর অঙ্গভ্যাগ করিয়াছে,—
যুগ্মে গৃহগুলি কুট্ট মূর্তি ধরিয়াছে। বতীন আর পূর্বে কখনও
একপ ব্যাপার দেখেন নাই,—তিনি অতি বিস্ময়ে চারিদিকে
চাহিতে লাগিলেন। নিশিবাবু সহসা বিস্মিত হইতেন না,—
তিনিও বলিলেন,—“কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র!”

ষথার্থই রন্ধনশালায় একটা হৈ হৈ ব্যাপার চলিতেছে।
কত লোক যে কত কাজ করিতেছে, তাহার স্থিরতা নাই।
এক দিকে সারি সারি চুলা জ্বলিতেছে;—তাহাতে বিভিন্ন
পাচক পাচিকাগণ রন্ধনে নিযুক্ত রহিয়াছে। কেহ কাঁচা কাটে
কুঁ দিতে দিতে গলদ্যপ্ত,—অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া, দেওয়ানজির
আদ্যশ্রদ্ধ করিতেছেন। কেহ বা ডালে সবলে মহাশব্দে কাটি
চালাইতেন। কেহ বা তণ্ড তৈলে মৎস্ত দিয়া আড়ষ্ট হইয়া সিটু-

কাইয়া আছেন। কেহ বা ভাতের হাঁড়ীতে আল দিতে দিতে ও পাড়ার কায়েতগিন্নির নানা ব্যাখ্যানা করিয়া পার্শ্ববর্তী রঞ্জিণীকে শুনাইতেছেন,—পার্শ্ব কলাপাতায় পর্কত প্রমাণ ভাতের ডাঁই হইয়াছে।

দালানে বড় বড় বঁটা লইয়া নানা রক্তবেরঙের রঞ্জিণীগণ লাউ, কুমড়া, আলু, কচু প্রভৃতি আনাজ কুটিয়া ডাঁই করিয়া ফেলিয়াছেন। অন্ধনে আঁমিরমা, রানৌরমা, ক্ষান্ত, সুখী, সুরূপা কুরূপা-গণ রাশিকৃত ছাই লইয়া বড় বড় রোহিত,—বড় বড় কই, মাগুর,—চুনা, পুঁটীর প্রাণ দণ্ডে নিযুক্ত আছেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা-জনের কুৎসা সবেগে চলিতেছে। উপরে চিল কাক ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে,—সুবিধামত ছোঁ মারিতেও ক্রটি করিতেছে না। কয়েকটা বিভাগ অর্ন্ত দূরে পা গুটাইয়া চক্ষু অর্দ্ধ নিম্নালত করিয়া একদৃষ্টে মাছের দিকে চাহিয়া আছে।

কোথাও বা দুই রঞ্জিণীতে মহা কোলাহল চলিতেছে। পাকশালার দ্বারে কয়েকটা উলঙ্গ অর্দ্ধ উলঙ্গ শিশু সহ ঝালা হস্তে তাহাদের জননীগণ ভাতের জন্ত দরবার করিতেছেন। কোথাও ছেলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে,—জননী হস্ত প্রস্তুত কিল চড়চাপড় ঝুটি অবিশ্রান্ত ধারে তাহাদের উপর দ্রুত দাম শব্দে পতিত হইতেছে। কম পক্ষে বোধ হয়, দুই শত লোক এক সঙ্গে কথা কহিতেছে। এ বিস্তৃত রন্ধনশালায় কাহারও কান পাতিবার সাধ্য নাই। তাহার উপর পার্শ্ব চৌকিশালায়

লক্ষী-লাভ

হুমদাম শব্দে বহু ঢেঁকি চলিতেছে ;—ধান ভাঙ্গা, চিড়া কুটা হইতেছে ! পার্শ্বে সারি সারি জাঁতার মুগ কসাই মুসরী ছোলা ডালরূপে পরিণত হইয়া ফরু ফরু শব্দে বাহির হইয়া আসিতেছে ! উঠানে দুই দশটা গরু আনাঙ্গের পরিতক্কায়শ ও কঙ্গাপাতার অবশেষ দুই চক্ষু মুদিত করিয়া মহানন্দে উদরস্থ করিতেছে । দুই চারিটা গ্রাম্য কুক্কর এখানে সেখানে নিদ্রাস্থ উপভোগ করিতেছে । এক দিকে বড় বড় কড়ায় কেবলই হুঙ্কার জাল হইতেছে !

চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে আস্ত্রায়, স্বজন ও দাসদাসী কর্মচারীতে প্রায় পাঁচ শত লোক প্রতাহ আহাৰ করিত ;—সুতরাং এক্রপ বিস্তৃত পরিবারের রন্ধনশালায় যে একটা হৈ হৈ উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ! বহুদিন জীবনে আর কখনও এক্রপ দৃষ্ট দেখেন নাই ! বথার্থই বিশ্বয়কর ব্যাপার ! এখানে কান পাতে কাহার সাধ্য ।

নিশিবাবু মুগ বিকৃত করিয়া দুই হস্তে কান চাপিয়া বরিলেন,—বলিলেন,—“ললিতবাবু,—এক্রপ যুদ্ধক্ষেত্র আর কটা পার হইতে হইবে ?”

ললিতবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“বড় পরিবার,—অনেক লোক খায় ! আমিও বড় একটা এদিকে কখনও আসি না ।”

অন্দরে পাকশালায় সহসা জমিদারপুত্রকে দেখিয়া একটা

হলুহুল কাণ্ড পড়িয়া গেল ! তাহার উপর তাঁহার সঙ্গে আবার দুই জন অপরিচিত যুবক । অধিকাংশ রন্ধিণীর মাথায় কাপড় ছিল না,—কাহারও কাহারও কাপড় আরও নিম্নদেশে নীত হইয়াছিল,—একণে ইহাদের তিন জনকে সহসা তাঁহাদের মধ্যে দেখিয়া, অনেকেই জীব কাটিলেন,—অতি কিপ্র হস্তে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন । ফেহ কেহ “ওমা !” বলিয়া ছুটিয়া গৃহের মধ্যে লুকাইলেন । প্রহারকারিণী চীৎকারশীল পুত্রের ডানা ধরিয়া টানিতে টানিতে এক গৃহমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন । সহসা সেই মহা কোলাহল স্তিমিত হইল,—নীরব হইল না । ফিস্ ফিস্ শব্দ চলিতে লাগিল । বতীন ও নিশিবাবু বুঝিলেন,—এবার তাঁহাদের সমালোচনা চলিতেছে ।

ললিতবাবু আর এ স্থানে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না,—উভয়কে লইয়া দ্রুতপদে বাহিরের দিকে চলিলেন । অন্ধরে দুইটি বৃহৎ মহল ;—এক মহলে পিশি, পিশতুতো ভগিনী,—মাসি মাসতুতো ভগিনী—দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া,—বিধবা সখবা, বৃদ্ধা প্রোচা, যুবতী বালিকা, শিশুতে পরিপূর্ণ ছিল । কাজেই এ বৃহৎ অট্টালিকার উপর নিচের বহুবিধ নূতন পুরাতন কাপড় ঝুলিতেছে,—কাঁথা, বালিশ, লেপ, বিছানা শুখাইতেছে,—চারিদিকে আবর্জনারও অভাব নাই ।

এই মহলের এক দিকে দাসীগণ বাস করিত, কাজেই সর্বদাই এখানে কলহ বিবাদ কোলাহল হল্পা চলিত । কেবল

লক্ষ্মী-লাভ

ফরী ঠাকুরাণীর মিষ্ট স্বভাবে ও দোৰ্দ্ধণ্ড প্রতাপে এ বিবাদ
বিসম্বাদ পূর্ণ মাত্রায় উঠিতে সক্ষম হইত না। অল্প মহলে
চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং বাস করিতেন। এটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ;
—সমস্ত ঘরগুলিতে পঙ্কের কাজ ;—মেজে ঝক্ ঝক্ চক্ চক্
করিতেছে। বহু পুরাতন নানা মূল্যবান আসবাবে ঘরগুলি পূর্ণ,
কিন্তু ইহার কোন গৃহেই নূতনত্বের সমাবেশ নাই। সকলই
প্রাচীন আনলের। বড় বড় কাঠের গিন্দুক,—চাকা বিশিষ্ট,—
কারুকার্যে খচিত। গৃহ কোণে সারি সারি বেতের ও টিনের
পেট্রা ;—উপরে সুন্দর সুন্দর কঁড়ির ও বেতের আলনা, সিঁকে,
ধেলনা। প্রাচীরে প্রাচীরে পুরাতন দেয়ালগিরি,—গৃহে গৃহে
নানা রঙ্গের বেল-লঠন, চৌক-লঠন, হাঁড়ী-লঠন। দুই চাবিটা
বৃহৎ ধূলিধূসরিত বহু শাখাযুক্ত ঝাড় কত কাল হইতে যে
এই খানে বুলিতেছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।
সুন্দর বৃহৎ শালকাট নির্মিত ষাট,—তাহাতে নানা রঙ্গের
মনোহর সূচিকার্যের চূড়ান্ত বাহার রেজাই, কাঁধা, চাদর।
সেরূপ সূচিকার্য হইতে বঙ্গীয় ললনাগণ বহুকাল বঞ্চিত
হইয়াছেন।

কোন কোন গৃহ আলপনার পূর্ণ। তাহাতে কত পশু,
কত পক্ষী, কত ময়ূর অঙ্কিত! তেমন চিত্র আধুনিক বঙ্গীয়
যেযেরা বহুকাল বিন্ধিত হইয়াছেন। বাড়ীটা ধূপধূনার সৌগন্ধে
বিভোর! গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই ছন্দে এক অভাবনীয়

পবিত্রতার ভাব সমুদিত হয়। আত্মীয়বন্ধনপূর্ণ মহলে সবাই যেন ঝড় ছুটতে ;—এ মহলে স্বর্গের স্বর্গাযত্ন সর্বদা বিরাজ করিতেছে।

ললিতবাবু তাঁহার বন্ধুদ্বয়কে এই মহলের ভিতর দিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন। সম্মুখে তাঁহার বৈঠকবানাবাড়ী। উচ্চ ফ্লোরের উপর স্থাপিত,—লাল রঙে রঞ্জিত, নূতন নির্মিত,—হাল কাসানে বড় দ্বার গবাক্ষে কাচের সাসিতে সুশোভিত। দরজা জানালা বার্ণিসে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মেঝে মারবেল মণ্ডিত,—গৃহগুলি সুন্দর রূপে পেট করা। চারিদিকে অপকণ্ঠ ননোহর পুষ্প-উদ্যান,—নব ছর্বাদলে সজ্জিত “লন,”—টেনিস খেলিবার স্থান,—যেথিঁর বেড়া,—ফুলের কেয়ার্ণ,—লতাবল্লরীর ‘কার্ণ হাউস’ ;—মধ্যে মধ্যে ফুয়ারা! সম্মুখে লাল সুরকির অপরিহার্য পথ। বাড়ীটা যেন একখানি ছবি।

ভিতরেও সমস্ত ঘরগুলি বিলাতী আসবাবে সজ্জিত। মধ্যে বহুমূল্য কোমল কারপেট বিস্তৃত। মধ্যস্থ গৃহ “ড্রইং রুম”। প্রাচীরে বড় বড় স্বর্ণক্রেমযুক্ত আঁসি,—মধ্যে মধ্যে ভাল ভাল ওয়েলপেন্টিং! সুন্দর মারবেল টেবিল, তদুপরি সুন্দর পুষ্পদানিতে সুন্দর সুন্দর গোলাপ সজ্জিত। গৃহ মধ্যমলমণ্ডিত সোফা ও কোচে পূর্ণ। একপার্শ্বে বিলিয়ার্ড খেলিবার ঘর,—অপর পার্শ্বে “ডাইনিং রুম,”—ভোজনাগার,—ইংরাজি খানর দ্রব্যাদিতে সজ্জিত। পশ্চাতে দুইটি সুদজ্জিত শয়নগৃহ;

লক্ষী-লাভ

তৎপশ্চাতে ইংরাজি হিসাবের বাতরুয়। সম্মুখে ও পশ্চাতে
যারবেলমণ্ডিত বিস্তৃত বারান্দা।

নিশিবাবু এই সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকায় প্রবিষ্ট হইয়া
বলিলেন,—“ললিতবাবু আপনার এখানে আসিয়া প্রাচীন
আমলের বাজালা,—আর নূতন আমলের বাজালা,—দুইই
দেখিলাম।”

ললিতবাবু হাসিয়া বলিলেন,—“আমার ইংরাজি ধরণের
বৈঠকখানা দেখিয়া এ কথা বলিতেছেন?”

নিশিবাবু বলিলেন,—“নিশ্চয়ই। যে অষ্টাদশ শতাব্দীর
বাজালা দেখিতে চাহে, কর্তার মহল দেখিলেই তাহার সে
ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আর যে আধুনিক উর্নাবংশ শতাব্দীর
বাজালা দেখিতে চাহে, তাহার আপনার বৈঠকখানায়
আসিলেই মনোবাস্তা পূর্ণ হইবে।”

যতান বলিলেন,—“আর যে আসল বাজালা দেশ দেখিতে
চায়, সে একবার ললিত, তোমাদের রান্নাবাড়ী ঘেন দেখিয়া
ষায়।”

এই সময়ে কে পশ্চাৎ হইতে বলিল,—“ব্রহ্ম কুপাহি
কেবলম্।”

যতান ও নিশিবাবু উভয়েই চমকিত হইয়া ফিরিলেন,—
দেখিলেন, একটা লক্ষ্যমান শব্দ ওজ্রলোক। তাঁহার জামার
গলার ও হাতের বোতাম নাই, পরিধান রেলির ধান; অঙ্গে

মোট লঙ্কখের চাদর, পায়ে তালতলার চটা, বয়স ত্রিশ
বৎসরের অধিক হইবে না।

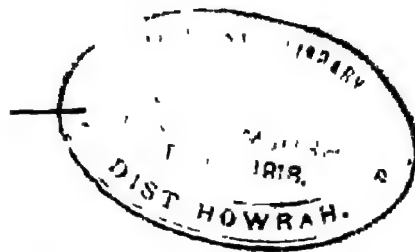
ললিত তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—“নিশিবাবু, বতীন,
ইনি আমার ভগিনী সুবালার শিক্ষয়ত্রীর স্বামী,—নবনীকান্ত
বাবু,—আত্মচরিত্র ব্রাহ্ম।”

নবনীবাবু মুখব্যাদন করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—“আপনার
বন্ধু। বড় আনন্দের বিষয়।”

নিশিবাবুর পট্টবস্ত্রাদি বেশ দেখিয়া ললিতবাবুর দিকে
কিরিয়া নবনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ইনি কোন্ পক্ষী?”

ললিতবাবু উত্তর দিবার পূর্বেই নিশিবাবু বলিয়া উঠিলেন,—
“বহাশয়, আমি বেওয়ারিস পক্ষী।”

ললিতবাবু হেঁ হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, বতীনও হাস্ত
সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গুরুগভীর প্রকৃতি ব্রাহ্ম নবনী-
বাবু এ বাচালতায় অতি বিরক্তভাবে মুখ বিষ্ণুতি করিলেন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধর্মচতুষ্টয়

নবনীবাবু একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া সহসা ধপ্ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন,—তৎপরে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উজ্জ্বল মুখ উত্তোলিতাবস্থায় গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তদবস্থায় বসিয়া নীরবে বোব হয় ভগবানের উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন,—যেগেতু তাঁহার ওষ্ঠ ঈষৎ আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাঁহার সহসা এই অর্ধ সমাধি অবস্থা প্রাপ্তিতে বতীন বিম্বিত ভাবে ললিতের মুখের দিকে চাহিলেন। নিশিবাবুও বিম্বিত ভাবে দাঁড়াইয়া দুই হস্ত বিস্তৃত করিয়া মুদিত নেত্রে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ললিতবাবু অতি কষ্টে ওষ্ঠে ওষ্ঠে পেষিত করিয়া কষ্টে হান্তাবেগ উপশমিত করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ নবনীবাবু তদবস্থায় থাকিবেন তাহার কোন স্থিরতা ছিল না,—সহসা তিনি চক্ষু উদ্বিল্লীত করিয়া নিশিবাবুর বিকট ভাব দেখিয়া ভয়াবহ ক্রুটি করিলেন;—কিন্তু দুর্ভাগ্য নিশিবাবু নবনীবাবুর চৈতন্ত লাভ অনবগত হইয়া তদবস্থায়ই রহিলেন। ইহাতে ললিতবাবু আর হান্ত সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিলেন। সেই হান্তধ্বনিতে নিশিবাবু চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিয়া, অর্ধ হস্ত পরিমিত দ্বিহা কাটিলেন,—হাসির রোল আরও উঠিল।

নবনীবাবু বড় গৌরবর্ণ লোক ছিলেন না ;—তাঁহার বৃহৎ গোল মুখানো দেহ হইতে অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ ছিল। সেই মুখ এক্ষণে কাল বৈশাখীর কাল যেষের জ্বার আরও কাল হইয়া উঠিল,—তিনি অতি ভয়াবহ গভীর ভাবে বলিলেন,—“ললিত-বাবু,—আমাদের রাগ করিতে নাই ;—সুতরাং আপনি বা অজ্ঞ কোন সাংসারিক লোক ইঁহাকে একটু সত্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করুন। আমি ইঁহার আত্মার জন্ত উপাসনা করিতেছি।”

নবনীবাবুর চক্ষু আবার মুদিত হইল ;—তিনি আবার গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিড় বিড় শব্দ করিতে লাগিলেন। হান্তোদ্যোগ উপশমিত করিতে গিয়া, নিশিবাবুর মুখ কান সকলই জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি একখানি সোফায় বসিয়া পড়িলেন। ললিতবাবুও হাসিতে হাসিতে বসিলেন। কেবল বতীন অস্থির,—তিনি নিশিবাবুকে সঙ্গে আনিয়া কি বিপদই করিয়াছেন ! প্রতিপদেই সে একটা না একটা বিপর্যয় ঘটাইতেছে !

কথঞ্চিৎ আশ্বাসপ্রদ করিয়া, নিশিবাবু বলিলেন, “মহাশয়,—দেখিতেছি আপনি মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আপনি মনে করিতেছেন, আমি আপনাকে কোনরূপে বিক্রপ করিতেছিলাম, তাহা নহে। আমার যুগি রোগ আছে,—তাহাই সময় সময় ঐরূপ বিকট ভাব হয়।”

লক্ষী-লাভ

নবনীবাবু তদবস্থায় অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, “উহু”—বিরক্ত করিবেন না। আপনার আশ্বাস জ্ঞাত উপাসনা করিতেছি।”

নিশিবাবু সে কথাই বড় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন,—
“যথার্থই আমি বেওয়ারিশ পক্ষী,—অর্থাৎ এখনও ধর্ম সন্ধান
কোন স্থির নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না। মিসনারী সাহেবেরা
বলিয়াছেন যে, আমি অন্ধকারে ঘুরিতেছি। তাঁহারা আমাকে
আলোকে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন,—কিন্তু
তাঁহাদের আলোক বড় চড়া বলিয়া বোধ হওয়ায়, আমি সে দিকে
আর অগ্রসর হই নাই। এখন আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে—”

নবনীবাবু সহসা চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন,—ভীক্ষু
বৃষ্টিতে নিশিবাবুর মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন,—
তৎপরে বলিলেন, “দেখিতেছি আপনি একজন ধর্মপিসাসু
লোক——”

নিশিবাবু অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “বিশেষ—অতিশয়।”

নবনীবাবু বলিলেন—“সন্তোষের বিষয়। আরও সন্তোষের
বিষয় যে আপনি খ্রীষ্টিয় মিসনারীদিগের ভ্রান্ত মত গ্রহণ করেন
নাই। প্রভু যিশুর প্রতি শত শত প্রণিপাত!”

এই দুই অসংলগ্ন বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়াক্রম করিতে
না পারিয়া নিশিবাবু বলিলেন,—“আপনি খ্রীষ্টানদিগের মত
ভ্রান্ত মত বলিতেছেন, আবার যিশুর পায় শত শত প্রণাম
করিতেছেন,—ইহার অর্থ বুঝিলাম না।”

নবনীবাবু তাঁহার বিস্তৃত মুখ আকর্ণব্যাদন করিয়া একরূপ বিকট হাসি হাসিয়া বলিলেন,—“এ সকল বড়ই দুর্লভ বিষয়। যদি আপনি দুই চারি দিন এখানে অবস্থিত হন, তবে যথাসাধ্য আপনাকে সকলই বুঝাইয়া দিব।”

এই বলিয়া তিনি ললিতবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“ললিতবাবুও অনেক ভ্রান্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি থিয়োসফিষ্টদিগের ভ্রান্ত মতে পতিত হইয়াছেন। তাহাদের কূট হিমলাল, তাহাদের বুদ্ধবুদ্ধি, তাহাদের মহাত্মা প্রভৃতি কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। এমন কি স্পিরিচুয়ালিস্ম বা ভূত প্রেতের কথাও বিশ্বাস করেন। বড়ই দুঃখের বিষয়,—বড়ই পরিচাপের বিষয়! আমি তাঁহার ভ্রম বিশ্বাস দূর করিবার জন্য প্রত্যহই যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছি। প্রত্যহ আমাদের অনেক সময় এই সকল গুরুতর আলোচনায় অতিবাহিত হয়।”

নিশিবাবু মনে মনে বলিলেন,—“ললিতবাবুর উদ্দেশ্য হইয়া যাইবার আর অধিক বিলম্ব নাই।” প্রকাশ্যে বলিলেন,—“মহাশয়, আমার প্রাণ এখনও সাদা রাখিয়াছি! ধর্ম সম্বন্ধে কোন ঝাঁচড় পর্য্যন্তও পাড়িতে দি নাই। সেই জন্যই আমি আমাকে বেওয়ারিস পছাঁ বলিয়া থাকি।”

নবনীবাবু বাবু যতীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“ইনি কোন পছাঁ?”

যতীন বিনীতভাবে বলিলেন,—“মহাশয়, আমি হিন্দু!”

লক্ষী-লাভ

নবনীবাবু সন্নিহনে বলিয়া উঠিলেন,—“এঁরা—গোঁড়া হিন্দু ?”

“আজ্ঞে হাঁ।”

“পুতুল পূজা বিশ্বাস করেন ?”

“আজ্ঞে হাঁ—বিশ্বাস করি।”

নবনীবাবু তাঁহার বিস্তৃত কাল জিহ্বা সমস্তই প্রায় মুখের বাহিরে আনিয়া কিংবদন্তি চক্ষু আকর্ষণ বিস্তৃত করিয়া বতীনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তৎপরে অতি বিশ্বাসপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরাজি লেখা পড়া শিখিয়া আপনি পুতুল পূজায় বিশ্বাস করেন। কি ভয়ানক !”

বতীন অতি বিনীত ভাবে বলিলেন,—“ইহাতে ভয়ানকটা কি দেখিতেছেন ?”

“ভয়ানকটা কি দেখিতেছি।” এই বলিয়া নবনীবাবু এক অভূতপূর্বভাবে বতীনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বতীন সেই দৃষ্টিতে নিতান্তই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতেছিলেন,—ইহা দেখিয়া নিশীবাবু মুখ অবনত করিয়া কষ্টে হাস্ত সংবরণ করিয়াছিলেন,—ললিতও যুহু যুহু হাসিতেছিলেন; কিন্তু নবনীবাবু এতই ভয়াবহ গম্ভীর হইয়া উঠিয়া ছিলেন যে, তাঁহাদের উচ্চ হাস্ত করিতে সাহস হইতেছিল না,—হাসি উদরে মহাপ্রলয় সংঘটিত করিতেছিল।

নবনীবাবু ধীরে ধীরে উঠিলেন,—চক্ষু হৃদিত করিয়া গুরু-

গভীর স্বরে আরম্ভ করিলেন,—“দাঁড়ান মহাশয়,—আপনার আত্মার জন্ত ভগবানের নিকট আমায় কাদিতে দিন।”

সরল চিত্ত স্বতীন বলিলেন,—“আমার আত্মার জন্ত আপনি কাদিবেন কেন?”

নবনীবাবু সে কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন,—“হে—পবন—কারুণিক—পদ্র—যে—”

সহসা নিশিবাবু দুই হস্তে পেট চাপিয়া ধরিয়া কাতরে বিকট স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—“ক্ষিণে—ভয়াবহ ক্ষিণে।”

সহসা ঘোর উপাসনার প্রারম্ভে নিশিবাবুর বিকট শব্দে নবনী-বাবু প্রকৃতই লম্বা দিয়া চক্ষু মেলিলেন, তাঁহার প্রার্থনায় বাক্য-বলি কণ্ঠে আসিয়া কণ্ঠেই রহিয়া গেল,—“তিনি রাগে অন্ধকার দেখিলেন;—তাঁহার বিকট অস্বাভিক মুখ অতি বিকটরূপ ধারণ করিল। তিনি ললিতবাবুকে বলিলেন,—“আমাদের ক্রোধ করিতে নাই,—নড়া—যাক্—এখন আমি বিদায় হই।”

ললিতবাবু পেটের হাসি কি কণ্ঠে পেটে রাষিতেছিলেন,—তাঁহা তিনি ব্যতীত আর কেহ অবগত নহে। তিনি যথাসাধ্য গান্ধার্য রক্ষা করিয়া বলিলেন,—“বন্ধন,—দেখিতেছেন তো বেলা প্রায় অপরাহ্ন হইল,—এখনও ইহাদের আহ্বারাদি হয় নাই! নিশিবাবুর ক্ষুধার উদ্বেক হওয়া বিচিত্র নহে।”

নিশিবাবু বলিলেন,—“দোহাই মহাশয়, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিতেছি না। এক পেট আহ্বারের পর একটু নিশ্চিন্ত হইয়া

লক্ষী-সাত

বতীনের আত্মার জন্ত আমি আপনার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কাদিতে প্রস্তুত আছি। আমিও ওর আত্মার জন্ত বিশেষ দুঃখিত।”

নবনীবাবু মুহূর্তেই জল হইয়া বাইতেন; বলিলেন,—তাহা হইলে আপনিও ইহার কুসংস্কার নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।”

নিশিবাবু বলিলেন, “রোজ—প্রত্যহ ? আহাঙ্গাদির পর আপনার সম্মুখেই আবার এ কার্য্য করিব। কিন্তু সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলা পাপ নয় কি মহাশয়।”

নবনীবাবু অতি সবেগে বলিলেন, “নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। এই জন্তই আমরা সকল কথার সন্ধিই বোধ হয় বোগ দিয়া থাকি। কি জানি যদি ভ্রমক্রমেও মিথ্যা বাহির হইয়া যায়! মিথ্যা অতি ভয়াবহ পাপ।”

নিশিবাবু কাতরস্বরে বলিলেন —“এই জন্তই ক্ষুধার বস্ত্রণা প্রকান্তে স্পষ্ট বলিতে বাধ্য হইয়াছি, ইহাতে এখন আর বিন্দুমাত্র বোধ হয় চলিতেছে না। এখন আর অন্ন কাদা আদৌ আসিবে না।”

এই সময়ে ললিতবাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—“এই সুবালা ও পত্রলেখা খবার নিয়ে এসেছে।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অন্ধুর

নিশিবাবু অতি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—“আঃ !”

নবনীবাবুর বিস্তৃত সারগর্ভ ধর্ম বক্তৃতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সকলেই প্রফুল্লিত, কেবল নবনীবাবু নহেন। তিনি বিবাদে ক্রকুটি করিলেন,—চেয়ারে ঠেস দিয়া চিতান ভাবে বসিয়া উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; তৎপরে বিষম স্বরে বলিলেন, “হায়,—সাংসারিক লোকের ভিতর অধিকাংশই অন্ধ ! কেহ তাহাদের আত্মার শোচনীয় অবস্থার কথা একবারও চিন্তা করে না !”

ললিতবাবু বা বতীন বা নিশিবাবু কেহই নবনীবাবুর সারগর্ভ বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। ললিতবাবু বলিলেন,—“এস যতীন,—অনেক বেলা হয়ে গেছে।”

সুবালা ও পত্রলেখা দুই হস্তে দুই রৌপ্য থালে নানা উপাদেয় আহাৰাদি লইয়া আসিয়াছিল ;—তাহাদের পশ্চাতে পাঁচ ছয় জন অর্দ্ধ অবগুষ্ঠনবতী দাসীও রৌপ্য গেলাসে জল, রৌপ্য থালায় ফল মূলাদি আনিয়াছিল। একজন সত্তর বারান্দার জল হিটাইয়া উত্তম গালিচা ও কারপেটের আসন পাতিয়া দিল। তখন সুবালা ও পত্রলেখা সেই আসনের সম্মুখে নানা আহারীয়-

লক্ষী-লাভ

পূর্ণ ধালা ও রেকাবি স্তরে স্তরে সাজাইয়া দিল। বতীন একরূপ জল খাবারের বৃহৎ বন্দোবস্ত আর কখনও দেখেন নাই। এ সমস্ত তাঁহারা কিরূপে আহার করিবেন,—এত শীঘ্র একরূপ আয়োজন কিরূপে হইল,—যাহা দেওয়া হইয়াছে,—তাহাতো বশ জনেও খাইয়া উঠিতে পারে না,—আহারীয়ের ভিত্তরে যে কি নাই তাহা বলা যায় না। খেয়ল সাজান হইল, তাহাতে দূরস্থ ধালা হাত দিয়া স্পর্শ করাই ক্লেশকর হইবে। এমন যে নিশি-বাবু তিনিও এই বাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বন্ধিনেন্ত্রে একবার আহারীয় সজ্জিত রোপা ধালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন,—আর এক একবার লুকাইত ভাবে পত্রলেখার দিকে চাহিতেছিলেন,—তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইবার তাঁহার চক্ষের সহিত পত্রলেখার চক্ষু মিলিত হইয়া গেল,—তাঁহার মস্তক ভূমির দিকে বেগবান হইয়া উঠিল,—তাঁহার এত যে বাক্যশ্রোত, তাহা সহসা যেন কিসে কে শুষিয়া লইল। তাঁহার ওষ্ঠের বাক্য বন্ধ হইল বটে, কিন্তু মনে মন নানা কথা কহিতে নিরন্তর হইল না,—সে বলিল, “নিশি,—প্রেম না লজ্জা! বাহাহ হউক, তোমার এ অবস্থা আর কখনও হব নাই, এটা স্থির।”

ললিতবাবু বতীনের দিকে চাহিতেছিলেন,—বতীনের অবস্থা নিশিবাবু অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছিল। তাঁহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার মস্তক উদ্ভোলনশীল বিলুপ্ত হইয়াছে,

—হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছে,—কেন। সুবালাকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ একরূপ বাগ্র হইতেছে কেন? সহসা তাঁহার শিরার রক্ত এত প্রবল বেগে ছুটিতেছে কেন? পূর্বে আর কখনও তাঁহার এ ভাব হয় নাই,—কেন?

ললিতবাবুর পুনঃ পুনঃ আহ্বানে উভয়ে নীরবে গিয়া দৌড় খুঁজে আননাধিকার করিয়া বসিলেন। ললিতবাবু স্বতীনের পাশে বসিলেন,—নিশিবাবুকে একটু দূরে আহারীয় দেওয়া হইয়া ছিল,—তিনিও বসিলেন, কিন্তু হাত বাড়াইতে পারিলেন না।

এই সময়ে নবনীবাবু আহার দ্রব্যের দিকে গলা বাড়াইয়া বৃষ্টিপাত করিলেন,—তৎপরে অতি বিষম স্বরে বলিলেন,—“বৎস সুবালা,—তোমার শিক্ষাত্রী কি তোমার অপচয় সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিতেছেন না।”

সুবালা বিস্মিত হইয়া নবনীবাবুর মুখের দিকে চাহিল। তাঁহার হইয়া পত্রলেখা উত্তর দিল,—বলিল, “মাষ্টার দাদা—এ তো সামান্য জল পাবার দেওয়া হইয়াছে,—ইহা অপচয় হইবে কেন?”

নবনীবাবু হতাশ ভাবে চেয়াবে ঠেস দিয়া বসিলেন,—দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “এ সংসারে, একরূপ ভুল্লুক লোক আছে, আমি তাহা জানিতাম না?”

ললিতবাবু হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। ইহাতে নিশিবাবুও স্বতীনও মুহূ হাসিলেন। স্বতীন কথা কহিতে পারিলেন

না,—নিশিবাবু হেট সুঙে বলিলেন,—“মহাশয়, আপনি বাহা বলিয়াছেন,—সেইটাই ঠিক ।”

নবনীবাবু গভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোনটা ঠিক,
—অপচয় না ষাওয়া ?”

নিশিবাবু কিছু বলিবার পূর্বেই পত্রলেখা বলিল,—“ষাওয়া ?”

নবনীবাবু বলিলেন, “উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভাগে জগতে
রাক্ষস জাতি যে এখনও বর্তমান আছে, তাহা আমার বিশ্বাস
ছিল না ।”

এবার তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন । ইহাতে নবনীবাবু মহা
রাগত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—“আপনাদের এখনও
পান্ডিত্য লাভ হয় নাই ! ললিতবাবু—আপনি দানবীর আহাৰ
দর্শন করুন,—আমার সে ইচ্ছা নাই । পরে, সাক্ষাৎ করিয়া
কাল যে সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা
বাইবে ।”

ললিতবাবু বলিলেন, “না—না—বন্ধন ।”

পত্রলেখা বলিল, “ললিত দাদা মাষ্টার দাদা এখন বান,—
দেখছেন না এঁদের ষাওয়া হচ্ছে না ।”

“এই বালিকা ঘোর বাচালিকা ।” এই বলিয়া নবনীবাবু
ক্রোধভরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন । ললিত বলিলেন,—
“নবনীবাবু বড় ভাললোক ”

“নিশিবাবু কেবলমাত্র বলিলেন,—“দেখিতেছি ।”

অন্ধর

“এখন বন্ধন—আর সময় নষ্ট কেন ? “এই বলিয়া ললিতাবাবু আহার আরম্ভ করিলেন,—ভাঁহার দেখাদেখি ষতীন ও নিশিবাবু হাত বাড়াইলেন । নিশিবাবু সবে এক টুকরা ফল মুখে দিয়াছেন, এই সময়ে পত্রলেখা বলিয়া উঠিল,—“গুরুঠাকুর মহাশয়,—আচমন কর্তে ভুলে গেছেন ।”

নিশিবাবুর মনে হইল যে পত্র লেখার স্মৃতির গালে সজোর ঠাসু করিয়া একটা বিপর্যয় চড় প্রয়োগ করেন,—কিন্তু সে উপায় নাই । তিনি ধতমত ঝাইয়া বলিলেন,—“আজ্ঞে,—হাঁ—তা—ওটা—ভুল—”

ললিতাবাবু হাসিয়া বলিলেন,—“এখানে আপনি গুরুঠাকুর মহাশয় নন ;—আমার বন্ধু, ষতীনের বন্ধু । এখানে ও সব ভুল হলে, কিছু আসবে যড়ব না ।”

নিশিবাবু হেট মুণ্ডে বলিলেন,—“ইনি এ কথা প্রচার কর্তে জটী কর্কেন না—একবারে জুরাচোর—”

পত্রলেখার মুখে শত শত গোলাপ প্রস্ফুটিত হইল ! সে অবনত মস্তকে পদনখে ভূমি খনন আরম্ভ করিল । ললিতাবাবু বলিলেন, “না,—পত্রলেখা কাকেও কিছু বলো না ।”

নিশিবাবু ও ষতীন আহারে বসিলেন, কিন্তু উভয়ের কেহই দানবীয় আহার দূরে থাকুক, পিপীলিকার আহারের নিকটেও উপস্থিত হইতে পারিলেন না । তাঁহারা যে নিতান্ত কমভোজী ছিলেন,—তাহা নহে । প্রত্যহ মেসের সেই নাতিসিদ্ধ আলুরদম

লক্ষ্মী-লাভ

ও জল-কল্লোলিনী ডাল যথেষ্ট চানিতেন,—কিন্তু আজ সম্মুখে এই চব্যচূষ্য জেছপেয় বাজতোগ পাইয়া তাঁহাদের ঘোর মন্দাগ্নি,— একেবারে আহারশক্তি লোপ পাইয়াছে। নিশিবাবু বন্ধিমেন্ত্রে ষতীনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে বলিলেন,—“আমার মন্দাগ্নির কারণ এই লক্ষ্মীছাড়া; ছুঁড়ি,—তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। হায়, এই দূর গণ্ডগ্রামে আসিয়া গাছপালা জঙ্গলের মধ্যে এত বড় দামী প্রাণটা খোয়াইলাম ? প্রেমে স্খলিত হইয়া, কেভাবে পড়িয়াছি, কিন্তু এখানে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এমন খাওয়া শুলো সম্মুখে পড়ে বেঘোরে মারা গেল ! আমার যেন কারণটা বুঝিলাম, কিন্তু ষতীন ছোঁড়া তো খুব লুপ্তে পারে। ব্রাহ্মভায়া ওর খাওয়াটা দেখলে দানবী! আহা! এর কতক আইডিয়াটা পেতেন, কিন্তু আজ ছোঁড়ার ক্লি হোল।”

সহসা তিনি মনে মনে বলিয়া উঠিলেন,—“ওঃ !”

বন্ধিমেন্ত্রে লুকাইত ভাবে ষতীন সুবাজার দিকে চাহিতে-
হিগেন,—নিশিবাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা দেখিল। তিনি মনে মনে হাসিয়া বর্ণিলেন,—“এক যাত্রার পূর্ণক ফল হব না। দেখিছি ছোঁড়ারও সর্বনাশ হয়েছে। ভাগ—ভাগ,—এনিম একটা বেঘোরে মারা যাব কেন ? সব কাজেই দেহের থাকা ভাল।”

বালতবাবুর জেদাঙ্গিহিতে উত্তরে একটু একটু করিয়া অনেক আহার করিলেন। অবশেষে ছুটি পাইয়া হাপ ছাড়িয়া উঠিয়া গৃহমধ্যে আসিয়া বসিলেন। পত্রলেখা স্বর্ণাভিবার পান

আনিয়া সন্মুখস্থ টেবিলে রাখিয়া বলিল,—“ললিত দাদা, আপনাদের সকলকারই খাবার ঠাকুর-বাড়ীতে হচ্ছে।”

ললিত হাসিয়া বলিলেন,—“যে রকম দেখছি,—আজ এক বেলার বেশী আর খেতে হবে না।”

পত্রলেখা চলিয়া গেল। ভৃত্য রোপ্য ট্রেতে সিগার ও সিগারেট, দেসলাই আনিয়া সন্মুখে রাখিল। একজন এক বৃহৎ স্বর্ণ ফুরশি আনিয়া ললিতবাবুর পার্শ্বে স্থাপিত করিল, আর একজন আল-বোলায় নগযুক্ত রোপ্য ব্রাঙ্কের হকা সট্‌বৈঠক নিশিবাবুর পার্শ্বে স্থাপন করিল, কিন্তু সকলেই নীরব,—ষতীন ও নিশিবাবুর মুখে কথা নাই।

ললিতবাবু ইহা পূর্ব হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একপ ভাব হইবার কারণ কি, তিনি তাহা কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। নূতন স্থানে আসিবার জন্তই কি তাঁহাদের একপ হইয়াছে! তিনি তাঁহাদিগের এই ভাব দূর করিবার জন্ত বলিলেন,—“ষতীন, তুমি এত বিমর্ষ কেন? এখানে কি কোন অসুবিধা হইতেছে?”

ষতীন ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “সেকি, তোমার এখানে অসুবিধা?”

ললিত বলিলেন, “তোমাকে আর নিশিবাবুকে যেন কেমন কেমন দেখিতেছি! নবনীবাবুকে ডাকা বাক্ অনেক মজা হ'বে?”

লক্ষ্মী-লাভ

নিশিবাবু বলিয়া উঠিলেন, “দোহাই আপনার ! আহারের পর আমার একটু নিদ্রা দেওয়া অভ্যাস আছে ।”

ললিত বাবু হাসিয়া বলিলেন, “জল খাবারের পরই কি নিদ্রা ! নিশিবাবু, আপনিও হার মানিলেন !”

নিশিবাবু ললিতবাবুর কথার উত্তর না দিয়া বলিয়া উঠিলেন,
—“ইনি আবার কে ?”

একজন জুতা মোজা পায়,কপালের উকি অর্ধ উত্তোলিত ব্রাহ্ম মহিলা, হাতে জাপানি পাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সহাস্তবদনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া মিহি সুরে সরু গলায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“ললিতবাবু,আপনার বন্ধুদের সহিত আলাপ করিতে আসিলাম । বড়ই আনন্দের বিষয়,—বড়ই সুখের বিষয় ! আমার ইন্ট্রিউস করুন ।”

ললিতবাবু বলিলেন, “যতীন, নিশিবাবু, ইনি আমার ভগিনী সুবালার শিক্ষয়িত্রী,—নবনীবাবুর জ্ঞা ।”

শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া একরূপ সবলে যতীন ও নিশিবাবুর হাত টানিয়া লইয়া আলোড়ন করিলেন । তৎপরে বলিলেন,—“ই, আমার নাম অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন , অনেক স্থানে আমি শিক্ষয়িত্রী ছিলাম । আমার নাম ত্রিপুরা তৈরবী পাক্‌ডানী । নবনীবাবু আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী । ললিতবাবু অতি মহৎ লোক ;—আমি তাঁহার ভগিনীকে নানা বিদ্যায় পরিপক করিয়া ফুলিতেছি ।”

অহুয়

এই অভূতপূৰ্ণ বেশে সজ্জিত অভূতপূৰ্ণ রমণী দেখিয়া বতীন
ও নিশিবাবু ত্তম্বিত, নিম্পন্দ । নিশিবাবু মনে মনে বলিলেন, “কি
সৰ্বনাশ !”

নবম পরিচ্ছেদ

বিকার

সহসা নিশিবাবু তাঁহার উদর নাখায় দেহাঙ্গ দুই হস্তে সবলে পেৰিত করিয়া মুখ বিকট বিকৃতি পুরঃসর কাতরকণ্ঠে অশ্রুট আৰ্ত্তনাদে বলিলেন,—“ল—ললিতবাবু,—বড় অগ্নের বেদনা,—শোব।”

ললিতবাবু অতি বিস্ময়ে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, “সে কি ! বড় কষ্ট হচ্ছে কি । আপনার কি অগ্নের বেদনা আছে ?”

নিশিবাবু তদবস্থায় বলিলেন,—“শো—শো—শোব।”

ললিতবাবু অতি ত্রস্তে বলিলেন,—“শুন,—শুন,—এইখানে শুন,—একটু বিশ্রাম করলে সেরে যাবে।”

নিশিবাবুর মুখ দেখিলে বোধ হয়, তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার আর অধিক বিলম্ব নাই,—তিনি কষ্টে পার্শ্বস্থ গৃহে লম্বা হইলেন । কাতরে বলিলেন,—“একটু—একটু—ঘুমাতে দিন ;—তা হলে সেরে যাবে ।

ললিতবাবু তাঁহার ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া ছিলেন ; সত্বর বলিলেন, “হাঁ—হাঁ একটু বিশ্রাম করুন । আমরা সকলেই এখান থেকে চলে যাবি ।”

নিশিবাবু অশ্রুট অব্যক্ত স্বরে বলিলেন,—“যতীন—যতীন থাক—ব্যায়রামের সময় বন্ধু—আঃ।”

যতীন ব্যাকুল ভাবে বলিলেন,—“আমি থাকছি—তুমি একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর।”

নবনীবাবুর গৃহিণী সহসা এই ব্যাপারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার দুই বৃহৎ গোল চক্ষু বিস্ময়িত করিয়া, তিনি অবাক হইয়া চাহিয়া ছিলেন ;—তাঁহার কণ্ঠের স্বর কণ্ঠেই বিলীন হইয়াছিল। তিনি বিষম স্বরে বলিলেন,—“আপনার বন্ধুত্ব সহসা রোগাক্রান্ত হওয়ায় আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আমি ও নবনীবাবু দুইজনে এখনই ইঁহার রোগ মুক্তির জন্য পরম কারুণিক পরামর্শের উপাসনায় বসিব।”

সহসা নিশিবাবুর পীড়িত হওয়ায়, ললিতবাবু প্রকৃতই বিশেষ চিন্তিত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি যতীনের বন্ধু,—তিনি তাঁহাদের গুরুঠাকুর মহাশয়,—তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া সহসা পীড়িত হওয়ায় সকলেই দুঃখিত,—হইবারই কথা। তিনি গাকডাসী-গৃহিণীর সদসুষ্ঠানের কথাই কোন উত্তর দিলেন না,—কাজেই তিনি না গজেন্দ্র—না হংস—না সিংহিনী—তথা বক গমনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ! ললিতবাবু অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে যে গৃহে নিশিবাবু শায়িত হইয়াছিলেন,—স্বাধ্য তাঁহার মস্তকের নিকট যতীন নিভাস্ত বিষমচিন্তে হতাশ ভাবে বসিয়া ছিলেন,—তাঁহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরের দিকে

লক্ষ্মী-লাভ

চলিলেন,—ভাবিলেন, নিশিবাবু একটু নিদ্রিত হইলেই স্নহ হইতে পারিবে। বিদেশে পরের গৃহে সহসা পীড়িত হইলে, গৃহস্থানী স্বভাবতঃই বড়ই চিন্তিত হইয়া থাকেন,—ললিতবাবু বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। স্বতীনতো একেবারে হৃতপ্রায়। তিনিই নিশিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন,—সে কোনরূপে এখানে পীড়িত হইয়া পড়িলে,—তাঁহার আর দুঃখের সীমা থাকিবে না।

ললিতবাবু বাহিরে আসিয়া ভৃত্যকে বলিলেন,—“চারিদিকে লোক দাঁড় করাইয়া দাও,—গুরুঠাকুর মশায়ের অসুখ হয়েছে। দেখ যেন কোন রকমে এখানে কোন শব্দ বা গোলমাল না হয়। খুব সাবধান। আমি নিজেই ডাক্তারবাবুকে ডাকিতে যাইতেছি।”

ললিতবাবু নিশিবাবুর জ্ঞা কি করা কর্তব্য, তাহা নিজে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অত্যাঁই পিতার সহিত পরামর্শ করিতে চলিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, স্বতীন আসিয়াছে,—কত আমোদ প্রমোদ করিবে, সহসা একি হইল ?

ভৃত্য সদর হইতে পাঁচ সাত জন লম্বা লম্বা লাঠিয়াল ডাকিয়া আনিয়া বৈঠকখানা বাটীর চারিদিকে পাহারায় দাঁড় করাইয়া দিল,—তাহারা লম্বা লম্বা লাঠি স্বক্কে ফেলিয়া মস্তকের দীর্ঘ বাবরি চুল নাচাইয়া ক্ষীত বন্ধে স্থানে স্থানে দাঁড়াইল,—চারিদিক নীরব নিস্তক।

সহসা নিশিবাবু সবেগে উঠিয়া বসিলেন। স্বতীন ব্যগ্র ভাবে বলিলেন,—“উঠলে কেন ? শোও—শোও।”

বিকার

নিশিবাবু বলিলেন,—“চুপ্—আন্তে,—আগে দরজার খিল দাও।”

শয্যা হইতে এক দীর্ঘ লম্ফে নিশিবাবু দ্বারের নিকট গিয়া তাঁহা নিমিষে বন্ধ করিলেন। বর্ত্তান অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহসা কি নিশির বিকার হইল। বিকারের একোপে কি সে এইরূপ করিতেছে! নতুবা একটু পূর্বে তাহার ধৈর্য্য মুখের ভয়াবহ ভাব হইয়াছিল,—তাহাতে তাঁহার হৃদয় আসন্ন ভাবিয়া বর্ত্তানের প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছিল;—সুতরাং সে এখন বাহা করিতেছে, তাহা বিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার প্রকৃতিই বড় ভয় হইল। তিনি শুনিয়াছিলেন,—বিকারের রোগী বাহাকে কামড়ায়, তাহার মুত্থা ঘটে কিন্তু বন্ধকে ফেলিয়া প্রাণ পলায়নও নিতান্ত কাপুরুষতা। পল্লিগ্রামের ম্যাগেবিসাময় জলে পড়িয়াই যে নিশির সহসা বিকার হইয়াছে,—তাহা বুঝিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইল না! বিদেশে তাঁহাকে আনয়া পদে পদেই তিনি কি ভয়ানক বিপদে পড়িতেছেন। কি কুক্ষণেই তিনি এবার কলিকাতা হইতে বাহির হইয়াছিলেন। নিশিবাবু নিকটে আসিলে, তিনি সতয়ে সরিয়া গিয়া অতি কাতরে বলিলেন,—“ভাই, একটু শোও।”

তাঁহার ভাণ দেখিয়া নিশিবাবু অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বর্ত্তানের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই দৃষ্টিতে বর্ত্তান স্পষ্ট বিকারের চিহ্ন

লক্ষ্মী-মাত

দেখিলেন। আরও ভীত হইয়া বলিলেন,—“তাই স্থির হইয়া শোও,—আমি ললিতকে একজন ডাক্তার ডাকিতে বলি।”

নিশিবাবু ফিস্ ফিস্ স্বরে বলিলেন,—“কেন?”

তাহার এইরূপ ভাবে কথা কওয়ায়, স্বতীনের বোধ হইল যেন তাহার স্বর একেবারে গলার ভিতর বসিয়া গিয়াছে। তিনি ভনিয়াছিলেন যে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মামুষের স্বর এইরূপ বসিয়া যায়। তিনি ভয়ে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন,—এ বিদেশে নিশিকে আনিয়া কি সর্জনশ করিলেন!

নিশিবাবু তাহার মুখের নিকট মুখ আনিয়া পূর্বরূপ স্বরে আবার বলিলেন,—“কেন?”

আর গোপন করা উচিত নুহে বিবেচনা করিয়া স্বতীন বলিলেন,—“পল্লিগ্রামের পুকুরে স্নান করে এই হোল।”

সেইরূপ ভাঙ্গা চাপা চাপা স্বরে নিশিবাবু বলিলেন,—“কি হোল?”

স্বতীন বলিলেন,—“স্থির হয়ে শোও,—আমি এখনই ডাক্তারের দ্বারা লোক পাঠাচ্ছি।”

নিশিবাবু দস্তে দস্তে পোষিত করিয়া স্বতীনের গণ্ডে চপেটাঘাত করিতে হস্ত উত্তোলিত করিলেন,—স্বতীনের শরীরের বস্ত্র জল হইয়া গেল,—তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—“শোও,—শোও;—তোমার বাতলেয় বিকার হয়েছে।”

তাহার পর নিশিবাবুর যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনাতীত!

বিকার

তিনি শব্দ্য পড়িয়া বিকট ভাবে তাঁহার অঙ্গ নানারূপ বিকৃতি করিয়া গড়াইতে লাগিলেন,—তাঁহার মুখ লাল হইয়া ভয়াবহ বিকট হইয়া গেল। তাঁহার হাত পায় ঝিল ধরিতে লাগিল,— তাঁহার মুখ হইতে ফেন ঝরিল,—একপ বৃহৎ ব্যতনা সরলচিত্ত আর বতীন কখনও পূর্বে দেখেন নাই,—এ কি সর্বনাশ হইল ! তিনি কি নিশিকে মারিয়া ফেলিবার জ্ঞান এখানে আনিয়া ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া চক্ষের জল বহিল,—তিনি কাতরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ইহাতে নিশিবাবুর বৃহৎ বহুশা আরও বৃদ্ধি পাইল,—বতীন বুঝিলেন যে, তিনি তাহাকে কি বলিতে চেষ্টা পাইতেছেন,—তাহাই তিনি মুখ তাঁহার মুখের নিকট আনিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন,—“তাই—ভগবানের নাম শুনাব কি ? হরে রাম—”

নিশিবাবু লক্ষ দিয়া উঠিলেন ;—বতীন অশ্রুট নিনাদ করিয়া। দ্বারের দিকে ছুটিলেন,—উপসংহারে কি ঘটিল, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত ছিল,—কিন্তু এই সময়ে বাহিরে একটা ভয়াবহ শব্দ উদ্ভিত হওয়ার উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

বাহিরে কেবল “হিস্—হিস্—হস্—ওখানে—চুপ্—চুপ্—হসিয়ার—” এই শব্দ স্তরে স্তরে উঠিতেছে ! দশ বিশ জন লোকে একত্রে সম্মুখেরে কেবলই “হিস্ ওখানে—হস্ ওখানে—চুপ্—হসিয়ার—ঐ দিকে—গোল নয়” শব্দ করিতেছে। বাহিরে রীতিমত একটা গোল পড়িয়া গিয়াছে। “চুপ ভাষা

অত গোল নয়।” “চুপ গোবিন্দ, গলা সামলে।” “হরে—গরু শীঘ্র এখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যা।” “নফর—ঐ দিককার কাকগুলো তাড়া।” অসংখ্য লোকে সম্বরে উচ্চৈঃস্বরে এই সকল কথা কহিতেছে,—সুতরাং ইহাতে এমনই একটা ভয়াবহ গোল পড়িয়া গিয়াছে যে, তাহাতে আর কাহারই কান পাতিবার উপায় নাই।

নিশিবাবু যুদ্ধ হাসিয়া বলিলেন,—“বুঝিলে কিছু?”

বতীন হতভম্বের ভায়ে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যাকুল ভাবে নিশিবাবুর দিকে চাহিয়া ছিলেন; তিনি বিব্রত ভাবে শাড় নাড়িলেন। নিশিবাবু হাসিয়া বলিলেন,—“দেখিতেছ না,—পাছে গোলমাগে আমার ঘুম না হয়, সেইজন্য ললিতবাবু এখানে বাতে কেউ গোল কর্তে না পারে, তার জন্য লোক মজাদার করিয়াছেন। দেখ একবার মজা! খুব চারিদিক নিস্তরূপ করেছ বাপধনেরা।”

বতীন বলিলেন,—“এখন কেমন আছ?”

নিশিবাবু ঈষৎ ক্রোধব্যাঞ্জক স্বরে বলিলেন,—“তোমার মত গোমূর্খ না হ’লে ভাবে যে আমার বাতগৈর্য বিকার হয়েছে! আমি মরুছি—বটে আমার নাম শুনান হচ্ছিল।”

“ভাই—”

“গাধা,—একটু শূলবেদনা না দেখালে ঐ বিদিকিচ্ছিরী মাগী-টার হাতে বক্তৃতার উপর বক্তৃতার গ্রাণ ধোয়াতে হতো।”

“তাহলে তোমার অসুখ”

বিকার

“অশুভ সাত জন্ম তোর হোক ? মুখ খুলে চোঁচিয়ে হানতে না পেরে গড়িয়ে হাত মুখ ঝিঁচিয়ে পেটের নাড়ি শুকু টন্টনিরে গেছে । কি আপদেই পড়েছিলাম !”

• “আমার বধার্বাই ভয় হয়েছিল । তোমার লীলা বুঝা ভার ! অমন ভয়ানক মুখের চেহারা কখনও করে !”

“মাক্—ও সব এখন থাক,—এস,—শুভ্রতর কথা আছে ।”

নিশিবাবু উঠিয়া আসিয়া বতীনের পার্শ্বে বসিলেন ; বলিলেন,—“বেটারা বাহিরের গোল খুব মন খুলে ঠাণ্ডা করুক,—জমিদার বড় লোক হওয়া যে মহাপাপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—কি আপদ ! শালারা হিস, হস, হাস, চুপ শব্দে যে পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলে । এতে কুস্তকর্ণের নিদ্রাতক হতো আমি কোন ছার !”

বতীন বলিলেন,—“শুভ্রতর কথা কি বলিবে বলিতেছিলে—”

নিশিবাবু কিয়ৎক্ষণ ভয়াবহ ভীষণ দৃষ্টিতে বতীনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন । ইহাতে বতীন ভীত হইয়া মুখ অস্ত্র দিকে ফিরাইয়া লইলেন, দেখিয়া নিশিবাবু মুহূ হাসিয়া বলিলেন,—“প্রাণের কথা গোপন করা পাপ,—আমি এই পত্রলেখা নামে মেয়েটাকে দেখে প্রণয়সাৎ হয়েছি । তুমি সুখালা সম্বন্ধে আমার পথানুশরণ করেছ । এ প্রেমরন্ধ্রে বিষ ভিন্ন আর কিছু ফলবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আর তিলান্বিত আশাদের এ স্থানে থাকা কষ্টব্য নয় । অথচ সহজে ললিতবাবু বা তাঁহার বুড়ো বাপ আশা-

লক্ষী-লাভ

দের ছাড়িবেন না। গরীবের ছেলে,—যদি বেঘোরে মারা যেতে
না চাও,—তবে আমার পরামর্শ শোন,—আজ দুপুর রাজে
আমার সঙ্গে লক্ষী লাও। আর এক দিন এখানে থাকলে,
একেবারে প্রাণটা প্রণয়ের দায়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। লক্ষী
দেওয়াই এর একমাত্র ঔষধ;—সুতরাং আর বিরক্তি কর না,—
নিশির পরামর্শ শুনে, এখান থেকে চম্পট দেও।”

দশম পরিচ্ছেদ

ডাক্তারবাবু

‘ললিতবাবু ডাক্তার লইয়া প্রবল-বেগে বৈঠকখানার দিকে ছুটিতেছিলেন,—সহসা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার-বাবু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“একি ললিতবাবু ?”

নাঠিয়ালগণ তখনও মহা সমারোহে গোল থামাইতেছিল,—তাহারা স্বয়ং ধ্বংস মহামারি ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছিল,—তাহাতে কাহারই কান পাতিবার উপায় ছিল না,—ললিতবাবু ত্রুটি করিলেন,—ক্রোধে আরক্তিম নয়নে,—পক্ষম তানে চীৎকার করিয়া “চুপ-চুপ” ধ্বনিতে চারিদিক্ প্রকম্পিত করিয়া বহু কষ্টে গোল থামাইলেন, রাগত স্বরে বলিলেন,—“দূর হ এখান থেকে সব।”

নাঠিয়ালগণ কার্য্য বোড়শোপচারে অসম্পন্ন করিয়াছে ভাবিয়া, মহা-গৌরবে ক্ষীতবক্ষে বাবরি নাচাইয়া বাহির বাটীর দিকে প্রস্থান করিল। ললিতবাবু, ডাক্তারবাবুকে লইয়া বৈঠকখানা-গৃহে আসিলেন, তাহার হস্তে এক লাল খাম,—চির পরিচিত টেলিগ্রাম।

নিশিবাবু ও বতীন উভয়ে অতি ভাল মাস্তকের স্তায় বৈঠকখানা গৃহে দুইখানি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন, বতীন সলজ্জ,—কিংকর্তব্য-বিমূঢ়,—নিশিবাবু অতি গো-বেচারী। ললিত

লক্ষী-লাত

সোৎসুক স্বরে বলিলেন,—“এই খে উঠে বসেছেন? কেমন, ভাল বোধ হচ্ছে?”

ডাক্তারবাবু বলিলেন,—“কোন বাবুটির অশুখ করেছে?”

বতীন হেট মুণ্ডে বসিয়াছিলেন,—নিশিবাবু ইঙ্গিতে ডাক্তার-বাবুকে তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন। ডাক্তারবাবু বতীনের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—“হাত দেখি মহাশয়, সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাটাও দেখান।”

বতীন চমকিত হইয়া মস্তক উত্তোলিত করিলেন, অতি বিশ্বস্তে বিস্ফারিত নয়নে ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“আমার —আমার নয়।”

ললিতবাবুও বলিলেন,—“না ওঁর নয়। নিশিবাবুর—আমাদের গুরুঠাকুর মহাশয়ের।”

ডাক্তারবাবু অতি বিরক্ত ভাবে ক্রুটি করিয়া বলিলেন,—“তবে কি জ্ঞাত ইনি ইহাকে দেখাইয়া দিলেন।”

ডাক্তারবাবু অতি ভয়াবহ ভাবে নিশিবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। নিশিবাবু অতি ভাল যাহুঘের গায় বলিলেন,—“অ্যাপনি যদি ভুল বুঝেন তো আমি কি করিব?”

ডাক্তারবাবু তাঁহার প্রতি অতি ঘৃণা-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ললিতবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“ললিতবাবু, আপনাদের গুরুঠাকুর মহাশয়ের কাছে আমার নিয়ে চলুন।”

ডাক্তারবাবু
D. S. HOWRAH

ললিতবাবু নিশিবাবুকে দেখাইয়া বলিলেন,—“ইনিই জমিদারের গুরুঠাকুর মহাশয় ?”

ডাক্তারবাবু মহা রাগত হইয়া উঠিলেন, অতি কষ্টে ক্রোধ হৃদয়ে উপশমিত করিয়া বলিলেন,—“ললিতবাবু, অনর্থক কৌতুক করা কর্তব্য নহে, সময় নষ্ট করিতেছেন কেন ? আপনি ধেরূপ বলিলেন, তাহাতে এক মিনিটে তাঁহার মৃত্যু ঘটিতে পারে,—করেন কি নীতি চলুন ।”

ললিতবাবু মহা অপ্রস্তুত হইলেন, বলিলেন,—“ইহারই অমুখ হইয়াছিল ; ইনিই আমাদের গুরুঠাকুর মহাশয় !”

ডাক্তারবাবু আবার বিকট ভাবে নিশিবাবুর দিকে চাহিতে লাগিলেন, মনে মনে বলিলেন, “বড় লোকের ছেলেগুলো এই রূপই অকাল-কুমাণ্ড হয় ? ইহাদের সহিত তর্ক বিতর্ক করা পাণ্ডিত্য আর কিছুই নহে, কেবল পয়সার লোভে ইহাদের চাকুরী করিতে হয় ।” মনে মনে এইরূপ গবেষণা করিয়া তিনি বাগ্র-গভীর-স্বরে নিশিবাবুকে বলিলেন,—“জিহ্বা বার করুন ?”

নিশিবাবু বিকট মুখ ব্যাঙ্গান করিয়া অর্ধ হস্ত-পরিমিত পানে চর্চিত এক লাল জিহ্বা বাহির করিয়া ডাক্তারবাবুর সম্মুখে ধরিলেন । ডাক্তারবাবু ক্রোধে আত্ম বিন্মত হইলেন, বলিলেন,—“তোমার কিছুমাত্র—কিছু হয় নাই !”

ললিতবাবু বলিলেন,—“একটু আগে বড় কষ্ট পাইতে-ছিলেম ।”

লম্বী-লাত

ডাক্তারবাবু বলিলেন,—“জিহ্বা ভিতরে নাও, ওঠ দাঁড়াও, পেট দেখি ?”

ডাক্তারবাবুর রূঢ়ভাবে ললিতবাবু নিতান্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—“ইনি আমাদের গুরুঠাকুর মহাশয়।”

ডাক্তারবাবু এ কথা আদৌ বিশ্বাস করেন নাই ; বলিলেন, “ললিতবাবু, আমি চিকিৎসক, আমাকে আমার কর্তব্য কার্য্য করিতে দিন। চিকিৎসা সম্বন্ধেও যদি আপনা-এঁ স্বাভাবিক ক্রিয়াতে চান, তবে আমাদের ডাক্তার অনাবশ্যক !”

ললিতবাবু আরও লজ্জিত হইলেন, বলিলেন, “না আমি তা বলিতেছি না,—বলিতেছিলাম, ইনি আমাদের গুরুঠাকুর মহাশয় ! মাননীয় ব্যক্তি।”

ডাক্তারবাবু সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া নিশিবাবুকে বলিলেন,—“উঠে দাঁড়ান মশায়, পেটটা দেখি ?”

এতক্ষণ নিশিবাবু নীরবে বসিয়াছিলেন, এবার কাতরে হাত জোড় করিয়া বলিলেন,—“দোহাই মশায়, এখনও পেট গজগজ কচ্ছে। এখন পেটটা টিপ্লে এই ললিতবাবুর কারপেট-টারপেট লামি,—এতে অপকর্ষ হয়ে যাবে ?”

“হি ললিত বাবু”। বলিয়া ডাক্তারবাবু মহা-ক্রোধে তথা হইতে প্রায় উদ্ধ্বাসে অস্তিত্ব হইলেন। ললিতবাবু প্রকৃতই অতি বিস্মিত হইয়া হতভম্বের মত তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন নিশিবাবু বলিলেন, “ললিতবাবু, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন

ডাক্তারবাবু

কেন ? আমার ও রকম কিট মাঝে মাঝে হয়, উহাতে ভয়ের কারণ কিছুমাত্র নাই !”

ললিতবাবু বলিলেন,—“আমার বড়ই ভয় হয়ে ছিল ?”

নিশিবাবু বলিলেন,—“ও কিছু নয়, আবার এখন দু দশ দিন হবে না। অনেক চিকিৎসা করেছি। কোন ভয় নাই। এখন আপনার হাতে ওটা কি ?”

ললিতবাবু বলিলেন,—“এ স্বতীনের এক খানা টেলিগ্রাম,—এইমাত্র এসেছে।”

“আমার” বলিয়া স্বতীন ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইলেন। আবার টেলিগ্রাম। কে পাঠাইয়াছে ! তিনি নিমেষে টেলিগ্রামখানি খুলিয়া পড়িলেন। অভুলবাবু টেলিগ্রাম করিয়াছেন,—“কাল আমার মোকদ্দমা, তুমি না আসিলে, আমি মারা যাইব।”

ললিতবাবু বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—“অভুলবাবুটা কে ? তাহার কি হইয়াছে ?”

স্বতীনের কিছু বলিতে হইল না, নিশিবাবুই সোৎসাহে অভুলবাবুর গল্পছিনাই-মোকদ্দমার আদ্যোপান্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন, শেষ বলিলেন,—“ললিতবাবু আজ আমাদের এখনই রওনা হইতে হইতেছে, আর কালবিলম্ব করা যায় না !”

ললিতবাবু বলিলেন,—“আপনিও যাবেন ?”

নিশিবাবু বলিলেন, “খানি তাঁর জামিনদার, আমাকেও যেতে হবে।”

লক্ষী-গাভ

ললিতবাবু বলিলেন,—“এ অবস্থায় আপনাদের থাকিতে
অনুরোধ করিতে পারি না, আমার গেলে কি কোন উপকার
হয় ?”

বতীন বলিলেন,—“না, তোমার আর কষ্ট ক’বুবার প্রয়োজন
নাই, নিশিবাবু আসুন।”

নিশিবাবু আর কোন কথা না কহিয়া সত্বর উঠিয়া প্রস্থানের
আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। ললিতবাবু তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া
বিস্মিত হইলেন,—কিন্তু বতীন ভিতরের গুঢ় রহস্য অবগত ছিলেন,
তিনি বিস্মিত হইলেন না। তখনই উভয়ে ললিতবাবুর সহিত
কর্তার নিকট গিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন,—
তাঁহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে মোকদ্দমার অবসানে আবার আসি-
বার জন্য অঙ্গীকারেও আবদ্ধ হইতে হইল। আবার উভয়কে
অন্দরে গিয়া কর্তা ঠাকুরাণীর নিকট বিদায় লইতে হইল,—
আবার পত্রলেখা ও স্মৃতির নয়নে নয়ন মিলিল। নিশিবাবু
বতীনকে একরূপ হিঁচুড়াইয়া টানিতে টানিতে টেনে দিকে ধাব-
মান হইলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া ললিতবাবু বলিলেন,—
“নিশিবাবু দেখিতেছি পরোপকারের জন্য সর্বদাই ব্যাকুল হন ?”

জনার্দন শর্মা বলিলেন,—“কি মহৎ বংশে জন্ম।”

নিশিবাবুর এস্থান হইতে একপ উচ্ছ্বাসে পলায়নের কারণ
ললিতবাবুর নিকট চিরকালই অজ্ঞাত রহিল !

উভয়ে কোন গতিকে সন্ধ্যার গাড়ী ধরিলেন। পল্লিগ্রামের

ষ্টেন,—অর্দ্ধদেহ লৌহবান-গহ্বরে প্রবেশাবিকার শান্তের পূর্বেই
ঘটা বাজিয়া উঠে,—গাড়ী ছাড়িয়া দেয়,—যতীনকে টানিয়া
ভিতরে দিয়া নিশিবাবু তাঁহাদের ট্রাক্‌সয় ললিতবাবুর লাঠিয়ালের
ইস্ত হইতে সবলে আকর্ষণ করিয়া ভিতরে লইলেন। অমনই
একব্যক্তি “উঃ” শব্দে ব্যাকুল আর্তনাদ করিয়া উঠিল,—রাগে
কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, “দেখতে পাওনা বাপু।”

নিশিবাবু বিনীত ভাবে বলিলেন, “কিছু মনে করবেন না—
মশায়।”

সে বলিয়া উঠিল,—“আর মনে করুবো আমার মাথা। পা-
খানা একেবারে চেপটে গেছে। ফেলে দাও তোমার ঐ—”

“এই সরিয়ে নিচ্ছি মশায়,” বলিয়া নিশিবাবু সবলে বাজ্ঞে
টান মারিলেন,—বেঞ্চের নিচে ট্রাক্‌ কিসে মহা আঘাত পাইল,
এক ব্যক্তি লাফাইয়া উঠিলেন,—বলিলেন, “গুড়ের কলসিটা
ভেঙ্গে ফেলো। তুমি তো ভারি ব্যস্তবাণী, লোক হে।”

নিশিবাবু বলিলেন, “কিছু মনে—”

সে ব্যক্তি ক্রোধে কাঁপিতেছিল,—নিশিবাবুকে আর কথা
কহিতে দিল না, বলিল, “রেখ দাও তোমার ‘কিছু মনে কর
না,’—বেয়াকুব লোক ! মনে কর না—আমার মাথা আর যুগ্ম !
দেখছ না উজ্জ্বল। পয়রা গুড়ের কলসিটা ভেঙ্গে ফেলেছ। কত
দূর থেকে কত কষ্ট করে আনছি,—মাংসক ! আমি দাম আদায়
করে নিয়ে তবে ছাড়ুব,—না হয় জেলে দেব।”

লক্ষ্মী-লাভ

গাড়ীর ভিতর একটা মহা হুসুহুস পড়িল। তরল শুড় গাড়ী প্রায় প্লাবিত করিয়া চারিদিকে ছুটিগ,—প্যাসেঞ্জারগণ যে বাহার জুতা, ব্যাগ, পোঁটলা, কাপড় সরাইয়া লইতে হড়াহড়ি আরম্ভ করিল,—অনেকে চটচটে শুড়ে চর্কিত হইয়াও গেল। সকলেই রোষ-কষায়িত-লোচনে নিশিবাবুকে ভক্ষীভূত করিবার জন্য তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল। গাড়ীর ভিতর একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিল,—হুই একজন “মারো শালাকে” বলিতেও ক্রটি করে নাই,—তবে নিশিবাবু যুদ্ধ-বিদ্যায়ও সুনিপুণ ছিলেন, তাঁহার দেহে অসীম বল ছিল, তিনি যুদ্ধ সমাগত দেখিয়া একখানা বেঞ্চির উপর দণ্ডায়মান হইয়া বজ্র-গভীর-স্বরে বলিলেন, “দেখ বাপুগণ, এতক্ষণ কোন কথা কহি নাই,—আর একটা কথা ঠোঁঠ দিয়া বার করিয়াছ কি,—এক একটার মূণ্ড ধরে এই শুড়ে জুবড়াইয়া দিব!”

নিশিবাবুর ভীমমূর্তি দেখিয়া সকলে নীরব থাকাই যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা করিল। মনে মনে তাঁহার কিরূপ আদ্যাশ্রদ্ধ হইতে লাগিল, তাহা অকথ্য।

ହତୀର ଅଂଶ ଭବିତବ୍ୟ

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রাম্য-পথ

সেই যে সকলে নীরব,—আর চুরাডাঙ্গা পর্যন্ত নীরব।
একজনের একটা ব্যাগ তরল শুড়ে নিষ্কিন্ত করিয়া নিশিবাবু,
বতীনের জ্ঞান জায়গা অধিকার করিয়া তাঁহাকে এক হেঁচকা-
টানে বেঞ্চের উপর বসাইয়া নিজে পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন,—পরে
এই বিষাদ-সাগরে একটু হর্ষের তরঙ্গ উৎপাদিত করিবারও
প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—কিন্তু শুড়ের স্মৃদুর গন্ধে, বিশেষতঃ
হস্তপদবস্ত্রাদি, তৈজসপত্র শুড়াধিকার লাভ করায় কাহারই মন
ঠিক ছিল না;—নিশিবাবুর চেঁচা বৃথা হইল;—কেহ তাঁহার
রসিকতার আনন্দ অনুভবে সক্ষম হইল না, কাজেই নিশিবাবু
পরামর্শ স্বীকার করিয়া এই অরসজ্ঞগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া
নীরব হইলেন। অন্ধকারে গাড়ী ছুটিতেছে, অন্ধ অন্ধকারে
যাত্রিগণ গভীরভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, কাহারও মুখে কোন
কথা নাই ?

গাড়ী অবশেষে চুরাডাঙ্গা ঠেসনে মহা শব্দে আসিয়া
ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে দণ্ডায়মান হইল। রসবিহীন বেরসিক
গোমড়াযুগে সহযাত্রীদের উপর নিশিবাবুর আর বিন্দুমাত্র
সহানুভূতি ছিল না। তিনি বতীনকে ঠেলিয়া প্ল্যাটফর্মে নিক্ষেপ

লক্ষ্মী-লাভ

করিলেন ; তৎপরে নিজে অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় সবলে ট্রাকবয়ও প্ল্যাটফর্মে নীত করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা জুতা শুড় মিশ্রিত আস্কে-পিটের মত ধপ করিয়া নীচে পড়িল, প্যাসেঞ্জার-গণ রোষ-কবাইত লোচনে আর একবার চাহিলেন—অনেকেই বিড় বিড় শব্দে কি বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু নিশিবাবুর তাহাতে দৃকপাত নাই। এই সময়ে হইসিল দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল,—নিশিবাবু যুটের মস্তকে ট্রাক তুলিতেছিলেন,—এই সময়ে একজন গাড়ী হইতে দুই হস্ত পরিমাণ গলা বাড়াইয়া প্রায় নিশিবাবুর যুটের নিকট যুথ আনিয়া বলিল, “হুঃ—শালা।”

নিমিষে নিশিবাবুর মর্তমান-সদৃশ অজুলি-শোভিত চপেটাঘাত ছুটিল,—তিনি চক্রবৎ ঘুরিয়া গেলেন,—কিন্তু হস্ত কাহারও অঙ্গ স্পর্শ করিল না,—তিনি প্রকৃতস্থ হইবার পূর্বেই গাড়ী প্ল্যাটফর্মে ছাড়িয়া গভীর অন্ধকারে চলিয়া গেল, কেবল দুই হইতে তাহার পশ্চাতের তিনটি লাল আলো তিনটি বড় লাল চক্কুর মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

এতক্ষণ বতীন নীরব ছিলেন,—এবার হাসিয়া উঠিলেন। নিশিবাবু বলিলেন,—“এতক্ষণ বাপু হাসি কোথায় ছিল?”

বতীন বলিলেন—“গাড়ীতে হাসিলে মার খাইতে হইত—তনিমে তো।”

“কি শুনিব?”

“কি বলে গেল।”

“ওঃ—বাজে কথার কান দিলে জগৎ শুদ্ধ লোকের নিকট-
কুটূষ হইতে হয়। কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলেতো বটে,—বহু-বিবাহে
অরুচি নাই।”

• “গাড়াতে একটা হাঙ্গামা করে ছিলে আর কি ! যেখানে
বাচ্ছ, সেইখানেই একটা হাঙ্গামা ঘটছে।”

নিশিবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—“সে কেবল
নিশির দূরাদৃষ্ট ! এখন চল,—রথ সংগ্রহ করি।”

“কর্তা এই দিকে আসেন,” বলিয়া ট্রক যন্তকে ঘুটে অগ্রে
অগ্রে চলিল,—“টিকিটখানা” বলিয়া এক তদ্রলোক নিমিষে
তাঁহাদের হস্ত হইতে টিকিট ছইখানা ছিনাইয়া লইয়া “আলম-
ডাঙ্গাসে মালগাড়ী ছোড়া” বলিয়া চীৎকার করিয়া ক্ষুদ্র আকিস-
গৃহে অন্তর্হিত হইলেন,—দূরে গুমটিতে অন্ধকারে “মালগাড়ী
ছোড়া” শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, দুই চারিজন রেলযাত্রী বাহারা
নামিয়াছিল,—তাহারা টেনের বহির্ভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র দোকান
গৃহের দিকে চলিল,—দোকান হইতে দুই একটা আলো মিটি
মিটি করিয়া জ্বলিয়া তাহাদের এবং তাহাদের আশ্রয়বস্ত্রপ
দোকানখানির অভিক্ষেপ জানাইতেছিল।

বাহিরে ছই ষোড়া কয়েকখানা গোবান উর্দ্ধ ধমনীতে অব-
স্থিত ছিল,—সম্মুখে প্রতি বানের গোগণ স্তম্ভত বিচালি চকু
মুদিত করিয়া চিবাইতেছিল,—সারথিগণ যাত্রীর প্রত্যাশায়
আমতলে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে চক্রাকারে বসিয়া রাজির গাড়ার

লক্ষী-লাভ

প্রতীক্ষা করিতে করিতে দা-কাটার গভীর ধূমে চারিদিক্
বিভোর করিয়া ভুলিতেছিল—সহসা হুটে সঙ্গে ছই বাবু দেখিয়া,
তাহারা ছই একজন গাজ্রোখান করিয়া বলিল,—“বাবুরা বাবেন
কোয়ানে ?”

নিশিবাবু গভীরভাবে বলিলেন,—“ধমপুরে !”

তাহারা ঘাড় নাড়িল,—তৎপরে আমতলস্থ সমবেত ব্রাহ্-
বর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—“আলিমুদ্দিন তাই কতি পারিস্
ধোমপুর কোয়ানে। কর্তা এ নামের গাঁ এ দিকে তো
দেখ্‌চি না।”

বভীন বলিলেন,—“আমরা মেহেরপুর বাব।”

একজন বলিল, “তাই কন,—আসেন। আমি আন্দাজ বেলা
ছইপরে পৌছায়ে দেবানে।”

নিশিবাবু বলিলেন, “দক্ষিণা—দুর ছাই—তাড়া কত নেবে ?”

সে বলিল, “তা বাবুগার খোস করে বকসিস নেবানে।
আসেন—দোকানে জল পান করে তামাক গুয়া খান,—আমি
বকনা ছুটাকে গাভীতে জুড়ে লই।”

উভয়ে দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলে গোয়ানসারবী
বলিল,—“ও হালুইকর তাই,—বাবুগার জলপান দাও,—দেখ্-
বার পাও না—বাবুরা এই ডাকগাভীতে নাবলেন।”

দোকানী বলিল,—“আমুন—এই দিকে বমুন।”

এই দিক অর্থে কি বুঝিতে হইবে, নিশিবাবু তাহাই পর্যা-

প্রাচ্য-পথ

বেশ করিতে লাগিলেন। দোকানের বিচিত্র ভাব! অল্প কেরোসিনের ধূমে অর্ধ-অন্ধকার অর্ধ-আলোকযুক্ত দুইটা রহৎ কুপি লম্বমান রজ্জুতে চাল হইতে ঝুলিয়া সেই অপূর্ণ বিপণিকে অন্ধকারের গাঢ় কাল আবরণ হইতে কথঞ্চিৎ বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে ;—তাহাতেই নিশিবাবু ও বতীন দেখিলেন, একখানা খাল্য ঠনঠরের চর্মপাদ্রকার সুখতলা বিনিমিত কয়েকখানা লুটি নামক সুখান্য পড়িয়া আছে,—পার্শ্বে এক যুক্তিকার গামলায় কুম্ভ-রসের ভিতর কয়েকটা কুম্ভতর রসগোল্লার অপভ্রংশ মাছি ও বোলতায় আবরিত হইয়া লীলা করিতেছে। ঢেলার মত মেদো-ঘোণা,—কাল গজা,—লৌহবৎ পক্কান্ন,—অতি অপক্কপ জিলাপী শোভা পাইতেছে।

দোকানী গৃহমধ্যস্থ ছিন্ন-মাদুর-আবরিত মাচা দেখাইয়া নিশিবাবু ও বতীনকে বলিল,—“এই ভিতরে এসে বসুন।”

উভয়ে মন্তক অবনত করিয়া কোন গতিকে চালের বাঁশ হইতে মন্তক রক্ষা করিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া মাচাধিকার করিলেন,—কিন্তু পর নুহুর্ন্তেই বিকট “কচ-কচ মচ-মচ” শব্দে নিশিবাবু লক্ষ্য দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন,—দোকানী বলিল,—“বসুন, ভাব্বে না।”

নিশিবাবু বলিলেন,—“তরসা কি ! শব্দটা বড় সুবিধা গোছ বোধ হক্কে না।”

সে বলিল,—“কত কুদো কুদো লোক বসে গেল, আর আপনারা বস্লে ভাব্বে।”

লক্ষী-গাভ

নিশিবাবু বলিলেন,—“তারা হয়তো কাঁপা ছিল।”

দোকানী হাসিল; বলিল, “না, বাবু—ভয় নেই বহন।
তামাক ইচ্ছা করুন। আপনারা?”

নিশিবাবু সন্তর্পণে বসিলেন,—দোকানদার হকা সংগ্রহ
করিতে উদ্যত হইয়া, বলিল,—“আপনারা?”

নিশিবাবু বলিলেন,—“আমরা পথিক।”

“বাবু তা জিজ্ঞাসা কচ্ছি না,—আপনারা?”

নিশিবাবু বলিলেন, “বলুলামইতো বাপু,—আর কি বলবো?
আমরা,—জানোয়ার নই, তাতো দেখে ভেই পাচ্ছে।”

দোকানী ভীকৃ দৃষ্টিতে কিয়ৎকণ নিশিবাবুর মুখের দিকে
চাহিয়া রহিল। নিশিবাবুর মুখে দ্বৈধ ধুম আবরিত আলোকেও
কোন উন্নততারচিহ্ন দেখিতে না পাইয়া ধীরে ধীরে বলিল—
“বাবু, আমি তা জিজ্ঞাসা কচ্ছি না—জিজ্ঞাসা কচ্ছি, আপনারা?”

নিশিবাবু—বলিয়া উঠিলেন, “কি মুড়িলেই পড়্লেম,—
আমরা কি,—আর তোমার কি রকমে বুঝাই,—আমরা পড়ো,—
কলেজের ছাত্র।”

দোকানী বলিল,—“ব্রাহ্মণের হঁকা দেব না শূত্রের হঁকা দেব?”

নিশিবাবু বলিলেন,—“ওঃ—এই কথা,—আমি ব্রাহ্মণের ছেলে
নে বিবয় সন্দেহ নাই। আমরা এই বহুটী কায়স্থ, তবে শূত্র
বলে স্বীকার করেন না,—ইহাকে বর্ষণ বলিতে পার।”

দোকানী বিম্বিত ভাবে বলিল, “বর্ষণ—বর্ষণ কই শুনি

নাই। জল চলে তো? বাবু,—আপনি ঐ কেরোসিনের খালি বাস্কেটায় গিয়ে বসুন। কিছু মনে কর্বেন না,—অনেক ভাল ভাল ঠাকুর মহাশয়েরা আমার দোকানে পদধূলি দেন।”

নিশিবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—“বর্ষা মশায়,—কেরোসিন বাস্কেট ষাও!”

ষতীন উঠিলেন,—বলিলেন, “তুমি তামাক খাও,—আমি গাড়ী দেখি।”

দোকানী বলিল,—“বাবু কিছু জলপান করুন, কি দিব! মোণ্ডা খুব উৎকৃষ্ট আছে।”

এই কথায় নিশিবাবু এমনই বিকট অভূত-পূর্ব উদ্গার স্বরে উদ্গারিত করিলেন যে, দোকানদার প্রায় চমকিত হইয়া লম্ব দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ষতীন হাসিয়া ফেলিল,—কিন্তু নিশিবাবুর মুখ কুণ্ঠিত হইল না,—তিনি পেটে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—“শিবা বাড়ী হইতে আসিতেছি,—এখন কিছুই হজম হয় নাই!”

“সঙ্গে কিছু লয়ে যান।”

“এ কথা ভাল,—ষতীন কি বল?”

“কি মিষ্টান্ন দিব?”

“ভাল যা থাকে দাও।”

চাকাটাকের বিষক্রয় করিয়া ঠোকা হস্তে নিশিবাবু গোবানের নিকট উপস্থিত হইলে, ষতীন বলিলেন,—“ওগুলো খেলে আর বাচবে না!”

লক্ষী-গাভ

“বাদের কাছে উপায়ে,—তাদেরই দিচ্ছি” এই বলিয়া নিশিবাবু গাভোয়ানকে বলিলেন,—“কর্তা,—আমরা এক পেট তোমাদের খাশা জলপান উদরস্থ করেছি,—তোমাদের জন্তও এক ঠোকা এনেছি, নাও।”

গাভোয়ান মহাহর্ষে ঠোকা লইয়া বলিল, “কর্তাদের খেয়েই মাথুব। এই আর হাটবারে কোলকাতার এক বাবুর ঝিনেদা পৌছায় দেই—কর্তা দুই চিড়ি মণ্ডা—“বলিতে বলিতে গাভোয়ান হাসিয়া ফেলিল এবং কথা সমাপ্ত না করিয়াই নিশিবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল,—ওঠেন কর্তারা! বকুনা জুতি!”

নিশিবাবু ও বতীন স্নড়ঙ্গ প্রবেশের জায় হেট মুণ্ডে কষ্টে গাড়ীর ছইয়ের ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় উচ্চ বিচালি-শব্দ্যর উপর গোবান-চালকের সুপরিষ্কৃত কহা শোভা পাইতেছিল। উভয়ে সেই সুধ-শব্দ্যর সুখাসন অধিকার করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন,—এমন সময়ে এক মহা বিপর্যয় ঘটিল,—একটা গরু অসময়ে দুটামি করিয়া সবলে দৌড় দিল। গাভোয়ান গরু সামলাইতে গিয়া গাড়ীর মুখ ছাড়িয়া দিল,—নিমেষে তাহা আকাশমুখী হইল, পশ্চাত্তাগ সম্বন্ধে ভূমি লইল,—বতীন গড়ায়-মান হইয়া কুপোকাত হইলেন,—তাহার উপর নিশিবাবু লুপ্তিত হইলেন। গাভোয়ান বলিল,—“কর্তারা দুঃখ পালেন কি?”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাট

কোন গতিকে গোবান গো-সংযুক্ত হটল,—তাহারা বহুতর লেজমলা খাইল, সঙ্গে সঙ্গে একটু লক্ষ রাখ করিয়া পশ্চাৎস্থ দুই পদের ব্যবহার করিতেও ছাড়িল না। তাহার বিনিময়ে তাহার আত্মীয়া ললনাপণ নানা মধুর সম্ভাষণে সম্ভাষিত হইলেন,—কোন গতিকে বতীন ও নিশিবাবু আবার হামাগুড়ি দিয়া বানের গর্ভস্থ হইলেন। সহসা প্রবল বেগে গোবংশাবতংশদ্বয় উর্দ্ধ্বাসে ছুটিল,—নিশিবাবু জরি লইয়া ছিলেন, তাহার উপর বতীন সাম্ভাষিতক ভাবে ভূমিসাৎ হইলেন। নিশিবাবু তাঁহাকে হিচড়াইয়া টানিয়া পার্শ্বে শাসিত করিলেন ;—বলিলেন, “বুদ্ধি থাকে তো সটান লম্বা হয়ে থাক। এ ব্রতের এই কথা।”

বতীন কথা কহিলেন না,—দুই হস্তে সবলে গোবানের দুই দিক্কার বংশদণ্ড ধরিয়া দস্তে দস্তে পেঁষিত করিয়া বসিয়া রহিলেন,—তাহাতেও শান্তি নাট, মধ্যে মধ্যে উত্তোলিত ও অবঃপতিত হইতে লাগিলেন। নিশিবাবু কিন্তু চক্ষু মুদিত করিয়া নাসিকা গর্জন আরম্ভ করিলেন। বতীন তাহার ব্যবহারে রাগিবেন না হাসিবেন তাহা স্থির করিয়া উষ্ণিতে পারিলেন না।

এইরূপে গাড়ীর ভিতর লক্ষ রাখ, এপাশে উৎক্লিষ্ট ও পাশে

লক্ষী-লাভ

বিক্রি হইয়া—অস্থিমাংস সমস্ত পেরিত হইয়া তাঁহারা রাজি
বাণন করিলেন। ক্রমে সূর্য্য মায়া পশ্চিম গগণ লাল করিয়া ধীরে
ধীরে উদিত হইলেন,—গাড়ীও মেহেরপুরের বাজারে আসিয়া
দণ্ডায়মান হইল। এতক্ষণে একটু বিশ্রামের অবসর পাইয়া
একটা গরু স্বকের দণ্ডের নিম্ন দিয়া স্নানকালে মন্তক অপসারিত
করিয়া লইল। অপরটার উপর সমস্ত ভার পতিত হওয়ায় সে
ধরাশায়ী হইল, “কর্ত্তারা হসিয়ার থাকবেন,” সারথীর মুখ হইতে এ
কথা বাহির হইতে না হইতে কামান হইতে নিক্ষেপ গোলার
জ্বাল নিশিবাবু ও বতীন স্বইচ্ছায় অনিচ্ছায় একেবারে বাহিরে
আসিয়া সেই বাজারের লক্ষ হাটুরিয়ার পদধূলি মণ্ডিত হইয়া গা
ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বতীন রাগতভাবে আর-
স্তিম নয়নে চাহিলেন, নিশিবাবু কানে পৈতা শুকিয়া নিকটস্থ
জঙ্গলের দিকে ছুটিলেন।

তখন গাড়িয়ান বলিল,—“এহান থেকে হৈ কাছারি দেখা
যায়। এই হানে কর্ত্তারা পাকের কাজ সারিয়া লন,—আমি বকনা
ছুটোরে ঘাস খড় দি।”

সে গাড়ী এক পার্শ্বে টানিয়া রাখিয়া গরু দুইটাকে টানিতে
টানিতে নিকটস্থ কর্জমাস্ত্র জলপূর্ণ পুষ্করিনীর অপব্রংশ ভোবার
দিকে চলিল। মেহেরপুরের এ বাজারটী প্রকৃত বাজার নহে,—
বাজার সহরের ভিতর,—এটা সহরের প্রান্তসীমায় স্থাপিত,—দুই
তিন খানি দোকান মাত্র আছে,—অপর সকলই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল

হাট

দোকান ঘর বড় বড় অথথ বটের ছায়ার স্তূখে বিশ্রাম লাভ করিতেছে, দেখিলেই বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে এটা একটা হাটের বিস্তৃত স্থান, এখানে হাটের দিন বহু দোকানের ও বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। বকনাঘর সমস্ত রাত্রি চলিয়া আর এক পদও অগ্রসর হইতে অসম্মতি প্রকাশ করায় সারথী এই স্থানেই রথ স্থাপনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চালকের বহু তাড়নায়ও তাহার। একপদও অগ্রসর হইতে অসম্মত হইয়াছিল। কাজেই মেহেরপুরের বহুদূরে উভয় পাছ রথহার। হইয়া দিশেহার। হইলেন।

নিশিবাবু নিরুদ্দেশ,—ষতীন কি করিবেন,—তাহাই সেই বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তা করিতে ছিলেন,—এই সময়ে নিশিবাবু কচ্ছ গুজিতে গুজিতে তথায় আসিয়া চক্ষের ইজিত করিয়া দূরস্থ জঙ্গল দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—“ঐ দিকে !”

ষতীন বলিলেন, “এখন থাক।”

নিশিবাবু বলিলেন, “এই ঝানেই স্রবিধা,—সহরে পাঁচ আইন আছে।”

সর্কাদে দারুণ বেদনা,—কি ক্রুদ্ধেই তিনি নিশিকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া পর্য্যন্ত এক যুদ্ধও শাস্তিলাভ করিতে পারেন নাই,—সমস্ত রাত্রি গোবানে অস্থিবাৎস চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে,—সর্কাদে বেদনা,—এত দুঃখেও নিশি-বাবুর বাক্যে ষতীনের হাসি আসিল, তিনি ষাড় নাড়িলেন।

লক্ষী-লাভ

নিশিবাবু বলিলেন, “তবে এই দোকান ঘরে এস,—এখান থেকেই ভোজনের কাজটা সেৱে বাওয়া যাক,—কি জানি ভগবান কি মাগাইয়াছেন।”

নিশিবাবু কথা শুনিবার লোক নহেন ;—সুতরাং বতীন কোন কথা না কহিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ক্ষুদ্র দোকানঘরখানি যে কিসের দোকান, তাহা বলা বড়ই দুৰ্ঘট। ঘরের এক পাশে একখানি মাচা,—তাহার উপর একটা শত ছিন্ন মাদুর,—মাচার পাশে প্রাচীর অবলম্বন করিয়া দুইটা ডাবা,—সম্মুখে কয়েকটা মাটির গামলা আছে বটে,—কিন্তু দ্রব্যাদির বড় সম্বন্ধ নাই।

উপরে দাঁড়ে একটা টিয়া পাখী,—তাহার বৃহৎ নীল লেজ নাচাইয়া আশুস্তকঘরের দিকে গোল চক্ষু উন্মোচিত করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে। নিশিবাবু অগ্রসর হইলে সে তাহার স্মারক কঠিন চক্ষু তাহার মস্তকে ব্যবহার করিবায় জ্ঞাত সমুদায় হইল দেখিয়া, নিশিবাবু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

দোকানী একটি ঘণ্টা পাশে রাখিয়া গৃহের বাহিরে ঘরের পাশে সবলে দাতন ব্যবহার করিতেছেন। গৃহঘারে এক সুগোল শ্রাব-বর্ণাসুন্দরী বাম হস্তে হকা, দক্ষিণ হস্তে কণিকা, তাহাতে পানে চর্চিত লাল ঠোঠ ফুলাইয়া হুঁ লাগাইতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে বক্সিস দুটিতে পাছদ্বয়কে বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, হাবে তাবে এই রঙ্গিনীর সর্বদা ডগ মগ করিতেছে।



এখানে থাকেই আয়োজন হতে পারে।”

(নন্দা নাভ—পৃঃ ১৭১)

হাট

নিশিবাবু আড চোকে এই প্রণয়ীযুগলের প্রণয় বিবরণ এক নিমিষে হৃদয়স্থ করিয়া দন্তমার্জনে নিযুক্ত দোকানীকে বলিলেন,—“এখানে পাকের আয়োজন হতে পারে ?”

• সে দাতন চালন আরও সবেগে বুদ্ধি করিয়া বলিল “যান।”

নিশিবাবু সাহসে ভর করিয়া সুন্দরীর সন্মুখীন হইয়া বলিলেন,—“যান কি বাছা ?”

সুন্দরী অপরূপ রজময়ী হাসি বৃদ্ধ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন,—“আ মরণ মিলে।”

এ রাগ নয় রজ, তাহা নিশিবাবু উপলব্ধি করিলেন, কিন্তু বতীন পশ্চাত হইতে তাঁহার কাপড় টানিয়া বলিলেন,—“চলে এস।”

নিশিবাবু বলিলেন,—“দাঁড়াও না বাপু, ব্যস্ত হও কেন,—বলি বাছা, আমরা এখানে ছুটি রেখে বেড়ে খেতে পারি কি ?”

• আবার সেই হাস্য, আবার মুখ ঘূর্ণন, তৎপরে, “পারো বই কি—বয় তোমায় নেয় না।”

নিশিবাবু যুদ্ধে সহজে পরাজিত হইবার নছেন, বলিলেন,—“ঐ যে তোমায় কতটা বল্লেন—”

এবার রজিণী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে প্রায় গড়াইয়া পাড়িয়া বলিলেন,—“ওমা, মিলে বলে কি ?”

তাহার উচ্চ হাস্তে দোকানী দাতন ফেলিয়া সঘর বতী লইয়া

লক্ষী-সাত

দাঁড়াইয়া উঠিল, গোহিনীনয়নে নিশিবাবুর দিকে চাহিতে লাগিল, বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল, “ভদ্র বাহুবীর মত কাপড় চোপড়, তোমরা তো খুব ভদ্রলোক দেখ্‌চি। মশায়, এখন থেকে যাও—ভাল—ভাল—ভাল হবে না বল্‌ছি?”

নিশিবাবু বলিলেন,—“তুমি রাগ কচ্ছ কেন বাপু?”

দোকানী রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—“রাগ—যাও এখনই—মশকারমো করবার আর ব্যয়গা পাওনি।”

আর একটা বিপর্যায় কাণ্ড ঘটে, যতীন কাতরে বলিলেন, “ভাই—তোমার পায়ে পড়ি চলে এস।”

নিশিবাবু একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, দোকানীর চীৎকারধ্বনিতে অন্তরা দোকান হইতেও দুই চারি জন লোক বাহির হইয়া সেই দিকে আসিতেছে, এ অবস্থায় এখানে আর বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা না করিয়া তিনি দ্রুত পদে মেঘেরপুরের পথে চলিলেন,—যতীন তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রায় ধাবিত হইলেন।

সহসা এক মলিন দুর্গন্ধময় গামছা যতীনের গলায় পড়িল,—সেই গামছা কে পশ্চাৎ হইতে সবলে টান মারিল,—যতীন পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন,—তিনি স্তম্ভিত ও চকিত। গোবানচালক ছুটির আসিয়া তাঁহার এ লাঞ্ছনা করিয়াছে—না দিয়ে বলিতেছে, “বাবুরা ভদ্রের বাহুবীর ভাবিছেলাম—আমারে টাকা সরচো!”

হাট

নিশিবাবু কিরিলেন, বলিলেন,—“বাপু হে, তুমি কি ভাব যে আমরা আমাদের বাল্ল পেটরা তোমার দান করে চলে যাব,”—তৎপরে তিনি চক্ষু আরক্তিম করিয়া অতি ভয়াবহ স্বরে বলিলেন,—“বেটা বিয়াকুব।”

গাভোয়ান সতয়ে বতীনের গলার গামছা ছাড়িয়া দিয়া কাতরে বলিল, “বাবুগার চেনবার পারিনি—ঠিক বলেছেন,—আপনাগার বাল্ল পেটরা গাড়ীতে রইছে।”

নিশিবাবু মুঠে তাহার নাকের উপর উত্তোলিত করিয়া গর্জিয়া বলিলেন,—“শালা আহম্মুক।”

সে রোক্তব্যমান স্বরে বলিল,—“কর্তা মাগ করে—ঐ মেয়ে মানুষটা বলে যে গোর সোয়ারী ভাগছে।”

“তবে বিয়াকুব তোকে মাগ কল্লম, বা,—গাড়ী নিয়ে বেহেরপুরে আর আমরা হেটে যাচ্ছি,” এই বলিয়া নিশিবাবু বতীনের দিকে চাহিয়া দুহু হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইলেন।

বতীন অতি দুঃখিত স্বরে বলিলেন,—“তোমার সঙ্গে এসে এ লাঞ্ছনাও সহ্য কর্তে হলো।”

নিশিবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “বতীন তুই দেখছি নিতান্ত রসবঞ্চিত,—বাপু যেয়ে মানুষের রসিকতায় রাগ।”

বতীন কথা কহিলেন না; তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। কোপে দুঃখে তাঁহার চক্ষু ভেদ করিয়া অশ্রু বাহির হইবার মত হইয়াছিল। তিনি সত্যই এবার

লক্ষী-লাভ

নিশিবাবুর উপর জুড় হইয়াছিলেন। তিনি বিনা বাঁক্য ব্যয়ে
নিশিবাবুর পঞ্চাৎ পঞ্চাৎ—মেহেরপুরের দিকে চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাছারি

গাড়োয়ান বলিয়াছিল, ঐ মেহেরপুর দেখা যায়, কিন্তু বতীন ও নিশিবাবু ঘণ্টাখানেক হাটন কাধ্যে নিযুক্ত রহিলেন, তবুও মেহেরপুরে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। পশ্চাতে কিরিয়া দেখিলেন তাঁহাদের রথ অতি মস্তুর গমনে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ধীরে ধীরে আসিতেছে ;—পথে মধ্যে মধ্যে লোক দেখিলেই নিশিবাবু জিজ্ঞাসা করেন, “বাপু, মেহেরপুর আর কত দূর ?”

“ঐ যে কর্ত্তা দেখা যায়,” বলিয়া সে চলিয়া যায়,—উভয় বন্ধুও চলিতে থাকেন, কিন্তু মেহেরপুর আর দেখা যায় না। নিশিবাবু অতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “এই আহম্মুকদের দূরতার জ্ঞান একেবারেই নাই।”

বতীনের কথা কহিবার আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, তিনি কথা কহিলেন না।

এক স্থানে দুইটা রাস্তা,—কোন পথে বাইবেন ভাবিয়া নিশিবাবু একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন একটা প্রোচ ব্রাহ্মণ স্মৃগোল ভুড়ি,—মস্তকে দীর্ঘ চৈতন,—গলায় পৈতা দ্রুত পদে সেই দিকে আগিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া নিশিবাবু বলিলেন,—“এইবার এক জন ভজলোক

লক্ষী-লাভ

পাওয়া গিয়াছে,—ইহাকে জিজ্ঞাসা করলে আর কতদূর ঠিক আছে জানতে পার্কে।”

ব্রাহ্মণ অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্রুত পদে যাইতেছিলেন, নিশিবাবু বলিলেন, “মশায়,—একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্কে ?”

ব্রাহ্মণ দাঁড়াইলেন বটে কিন্তু অতি রাগত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। নিশিবাবু অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—“মেহেরপুর আর কত দূর আছে ?”

“কোথায় যাবে ?”

“এইতো বলিলাম মেহেরপুরে।”

“আর মশকারমো করবার যায়গা পাওনি—আহম্মুক ! এ দিকে আমার গরু পঙেতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে,” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ উর্দ্ধ্বাসে ছুটিলেন।

নিশিবাবু হাসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, “বৎসর্ষই বেশী দিন কলিকাতায় থেকে আমরা আহম্মুখ হয়ে গিয়েছি। ইহাদের লীলা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।”

এই সময়ে এক জন চাষা লাঙ্গলবন্ধে দুইটী গরু তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। নিশিবাবু তাহাকে ধরিলেন ;—বলিলেন, “মেহেরপুর আর কত দূর আছে ! দোহাই বাপু, ঐ দেখা যার আর বলো না !”

সে নিশিবাবুকে উদ্ভ্রান্ত ভাবিয়া বিম্মিত ভাবে বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বোধ হয় তাঁহার মুখে

১ নাকাহারি

সেইরূপ কোন চিহ্ন না দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—“কর্তা, এইতো মেহেরপুর আসছেন।”

নিশিবাবু বলিয়া উঠিলেন,—“এসেছি! কোথায় তোদের ‘সহর’?”

কৃষক বলিল,—“সহর কর্তা একটু দূর হবানে, এই দুই চার রশি—ঐ হাকিমের কুঠি দেখা যায়।”

“আর কাছারি কোথায়?”

“ঐ কাছারি হচ্ছে—হুজুর বেয়ানে কাছারি করেন।”

“বেয়ানে কাছারি করেন—সে কি! তোদের হাকিম সকালেই কাছারি করেন?”

“হা কর্তা,—ঐ কাছারি হচ্ছে।”

“শীঘ্র শীঘ্র, কি মুকিল,—সবই বিটকেল,” এই বলিয়া নিশিবাবু বতীনের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ছুটিলেন; বলিলেন,—“হয়তো এতক্ষণ মকদ্দমা হয়ে গেল। তবে ভয়ের কোন কারণ নাই।”

বতীন অতি ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, অতি ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভয় নাই কেন?”

“তার বন্দোবস্ত আছে শীঘ্র এস,” এই বলিয়া নিশিবাবু ছুটিলেন,—তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বতীনও ধাবিত হইলেন। পশ্চাৎস্থ রথ, তদুপরিস্থ তাঁহাদের বাস গেটরা, সকল কথাই তাঁহারা বিস্মৃত হইলেন।

জঙ্গী-লাহ

সম্মুখে কাছারি বাড়ী,—একটা লাল অট্টালিকা, দুয়ে দুই একখানি মেটে আটচালা,—ইহাতেই দুর্ভাগ্য যুগ্মকগণের স্থান। —ইষ্টকালরে হাকিমই বার দিয়া উপবিষ্ট হইলেন। এ হাকিমটির অনেক বিষয়ই নূতন,—সকলে যথানির্দিষ্ট সময়ে কাছারি করেন কিন্তু ইহার দুই প্রহরে নিদ্রা দিবার অভ্যাস থাকায়,—সকালে ও সন্ধ্যায় কাছারি করিয়া থাকেন। তাহাতে যে বহু হতভাগ্যের নানা ক্লেশ পাইতে হয়, তাহা তিনি একবারও তাঁহার বিশাল ছদ্মবে স্থান দান করেন না।

আজও বিত্তীষিকা উৎপাদক হাকিম কাছারিতে বার দিয়া বসিয়াছেন,—সম্মুখস্থ বটরুকনিয়ে দুর্ভাগ্য উকিল মোক্তারগণ প্রাচীন কালের ইজের চাপকান ও স্যামলাধারী হইয়া কানে কলম খুঁজিয়া ঘুরিতেছেন,—স্থানে স্থানে মামলাকারীদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন লালপাগড়ী নীলকুর্ভাধারী রাজ-প্রতিনিধিগণ দুই পরস্পর সংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছেন। হজুরের চাপরাশি বড় ব্যস্তসমস্ত হইয়া এ দিকে ও দিকে ঘুরিতেছে,—স্থানে স্থানে আসিয়া ব্যগ্র ব্যাকুলিত ব্যক্তিগণের সহিত ফিশ্ ফিশ্ করিয়া কি বলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সিকি দুয়ানি স্থানান্তরিত হইতেছে !

তবে আদালতের বাহিরে বড় লোকসমাগম নাই,—নিশি-বাবু দেখিলেন, আদালতের ভিতরই বড় ভীড়,—সকলেই সেই স্থানে উঁকি মারিতেছে ! বতীন ব্যগ্রভাবে অতুলবাবুকে খুঁজিতে

কাছারি

লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোথায়ও দেখিতে না পাইয়া বড়ই ভাবিত হইয়া উঠিলেন। নিশিবাবু আদালতের দ্বারে আসিয়া গলা বহু উর্ধ্বে তুলিয়া উঁকি মারিলেন,—তাঁহাতে উচ্চাসনে উপবিষ্ট একটা মাত্র গভীর ভাবাপন্ন যুগু দেখিতে পাইলেন,—কর্ণে হাউ হাউ কতকটা অল্পষ্ট শব্দ মাত্র প্রবেশ করিল,—বুঝিলেন সে বাঙ্গালীর কণ্ঠস্বর নহে !

গৃহমধ্যে এতই ভীড় যে প্রবেশের উপায় ছিল না,—সকলে নীরব নিম্ভক,—কাহারও কোনরূপ শব্দ কবিবার সাহস ছিল না, কারণ এই শাকিমটি এতই কড়া যে, তাহার আদালতে কেহ বিন্দুমাত্র শব্দ করিলে তিনি চাপরাশি দিয়া তাহার কান মলিয়া দিতেন। দ্বারে নন্দাকে পরাজিত করিয়া এক লালপাগড়ী পাহারায় ছিল, নিশিবাবু ভীড় ঠেলিয়া একটু ভিতরে দেহ প্রবেশ করণের উদ্যম করায় সেই ভীম মূর্ত্তি অল্পষ্ট চোপ শব্দ করিয়া তাঁহাকে সবলে দূরে বিতাড়িত করিল। অগত্যা নিশিবাবু বাহিরে আসিলেন। জননীর অঞ্চলধারী শিশুর ত্রায় বতীন, নিশিবাবুর সঙ্গ ছাড়িতে ছিলেন না,—তিনিও হতাশ চিত্তে বাহিরে আসিলেন।

নিশিবাবু এক কলম কর্ণে ছিন্ন চাপকানধারীর নিকট আসিয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মশায়, কার মকদ্দমা হচ্ছে ?”

তিনি ভীত দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ নিশিবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তৎপরে বলিলেন,—“আপনারা বেধু হয় কলকাতা থেকে আসছেন ?”

লক্ষী-গাও

“আজ্ঞে হাঁ!”

“আপনার নাম কি নিশিবাবু?”

“আজ্ঞে হাঁ!”

“এই দিকে আসুন—এই দিকে আসুন—ওরে গোপলা এই খানে ভাল গালচে খানা পেতে দে—বেটা, ভাল ব্রাহ্মণের হকুম তামাক নিয়ে আয়!”

বতীন অবাক,—তিনি এই ভদ্রলোকের এক কথারও অর্থ উপলব্ধি করারে পারিলেন না,—তিনি বিস্মিত ভাবে লোকটির মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন! নিশিবাবু কি বলিতে বাইতেছিলেন, কিন্তু চাপকানধারী তাঁহাকে কোন কথা বলিতে দিলেন না,—বলিলেন,—“বসুন—বিশ্রাম করুন, আপনারা বড়লোক, নিশ্চয়ই এতদূর আসতে খুব কষ্ট হয়েছে—খান—তামাক খান,—গোপলা, বেটা লোক চিনিস নে,—তোরা ভাল খিলি বেশ পকাশটা নিয়ে আয়!”

বতীন এতক্ষণে স্থির সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, লোকটি নিতান্তই উদ্বাস্ত। এতক্ষণে নিশিবাবু কথা কহিবার একটু সময় পাইয়া বলিলেন,—“আপনি—”

তিনি ব্যগ্রভাবে হাত্তে মুখব্যাধন করিয়া বলিলেন,—“আমি আপনার জুনিয়ার মোক্তার, আমার সিনিয়র রায়হরি আদালতে আছেন, এখানকার সেরা উকিল দোলগোবিন্দবাবু সাহেবকে ইনিস্ট্রাকসন দিচ্ছেন,—সাহেব খুব লড়ছেন,—আমরা তুড়ে দিবে

কাছারি

জিতে নেব। কোন ভয় না চিন্তার কারণ নেই—তামাক খান,
—কিছু জল খাবারের বন্দে বস্তু করি।”

নিশিবাবু কোন কথা বলবার পূর্বেই তিনি “জামা—বেটা
এই দিকে আয়,” বলিয়া ছুটিলেন।

তখন বতীন, নিশিবাবুকে বলিলেন,—“এ লোকটা কি বলে,
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! এ কার মকর্দ্দমার কথা বলছে!”

নিশিবাবু বলিলেন,—“অতুলবাবুর মকর্দ্দমা। তাঁরই
মকর্দ্দমা হচ্ছে।”

বতীন অতি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—“তবে শীঘ্র চল।”

নিশিবাবু বলিলেন,—“আমরা গিয়ে কি কছি! দেখিলে তো
সে ছয়গারে জাগে হুহু। বাহাদের থাকা উচিত, তারাই আছে।”

“আমি কিছুই বুঝিতে পারি নে!”

“এই পর্য্যন্ত জেনে রাখ, নিশি যে কাজে হাত দেয়, তার
শেষ পর্য্যন্ত না দেখে ছাড়ে না। আমি অতুলবাবুর মকর্দ্দমার
বখন ভাব লইয়াছিলাম, তখন সে সবকিছু বাহা করা উচিত তাহা
করিয়াছি। আমার একজন কণ্ঠচরী ব্যারিষ্টার লইয়া এখানে
এসেছে—এক মোস্তারতো দেখলে,—এই রকম আরও দুচারটে
নয়না ঐ ভিতরে আছে! রক্তচক্রে অনেক কার্য উদ্ধার
হয়—বতীন ভায়া—”

তৎপরে অতি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—
“তবে সব হয় না।”

লক্ষী-লাভ

বতীন বলিলেন,—“সে কি?”

নিশিবাবু হতাশ ভাবে বলিলেন,—“সে পত্রলেখা।”

এই সময়ে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,—“এই যে বাবু এসেছেন! মকদ্দমা জিত হয়েছে। এই সাহেব আসছেন, —আপনার কথা বলি।”

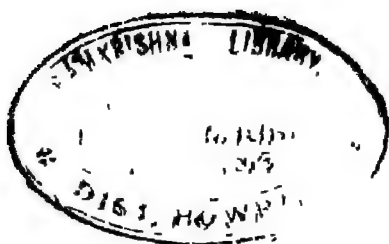
তিনি আবার ছুটিলেন, এই সময়ে বহু লোকে পরিবেষ্টিত হইয়া কোন্সিল সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া নিশিবাবুর হস্ত প্রায় তাঁহার ডানা হইতে বিচ্যুত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“আপনার বন্ধু খালাস পাইয়াছেন। এই হাকিমটির নিকট এই প্রথম গুরুছিনাই মকদ্দমা খালাস পাইল। ইহার আদালত এই বৎসরে চারি হাজার ছয় শত নব্বইটা গুরুছিনায়ের মকদ্দমা হইয়াছে। সকলেই জানিয়াছে যে, গুরুছিনাই মকদ্দমা হইলে হাকিমটি জেল দিয়া থাকেন, তাহাই যে বাহাই করুন, চুরি ডাকাতি জাল সব মকদ্দমাই গুরুছিনাই বলিয়া নালিস করে, স্মরণ্য বলিতে হয়, হাকিমটি একটা প্রকাণ্ড উটু!”

বতীন নিশিবাবুর পশ্চাতেই দাঁড়াইয়াছিলেন,—অতুলবাবু খালাস পাইয়াছেন শুনিয়া আনন্দে তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল,—তিনি কথা কহিতে পারিলেন না,—অতুলবাবুর মুখের দিকে ব্যাকুল নয়নে চাহিতে লাগিলেন।

সাহেব হাসিতে হাসিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। অতুলবাবু

কাছারি

সজলনয়নে নিশিবাবুর হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—“আপনিই আমার
রক্ষা করিলেন,—আপনার ঋণ শোধ দিবার নয়।”



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নৌকায়

গোবান বাত্রার সাধ নিশিবাবুর আর বিন্দুমাত্র ছিল না। বতীনের অস্থিমজ্জার বেদনাও ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল,—তাহাই মকদ্দমায় জয় লাভ করিয়া, তাহার। এবার নৌবানে অভিযান করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। অতুলবাবু কোঙ্কদারী দণ্ডবিধির কয়াল কবল হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদের অনুসঙ্গী হইলেন।

আর এ স্থলে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করা মূল্যবান সময়ের অপব্যবহার করামাত্র ভাবিয়া, তাহার। তিন জনে বহুদূর পদব্রজে আসিয়া, এক দুই মাল্লার নৌকা ভাড়া করিয়া, আবার পথের পথিক হইলেন। নৌকা তরতর করিয়া বতীনের দেশাভিমুখে ধাবিত হইল।

নিশিবাবু ক্ষুদ্র নৌকার ক্ষুদ্র ছয়ের ভিতর শয্যা রচনা করিয়া লম্বা হইতেছিলেন, কিন্তু বতীন বলিলেন,—“এ বেলায় খাবার দাবারের কি হবে?”

অতুল বাবুর এ পথে বাওয়া আসা ছিল,—তিনি বলিলেন,—“আর একটু গেলে বন্ধুদের বাজার পাইব; সেখানে সব কিনিয়া লইয়া রাখা হইতে পারে।”

বতীন বলিলেন,—“নিশিবাবু, রাঁধবে মাকি ?”

নিশিবাবু চক্ষু হৃদিত করিয়া দূরস্থ কোন অপক্লম মুখের গভীর
ধ্যানে নিমুক্ত ছিলেন, তদবস্থায় বলিলেন,—“নিশ্চয়।”

আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। ক্ষেপণীর তালে
তালে নিক্ষেপণে ক্ষুদ্র নদীবক্ষে ক্ষুদ্র নৌকা নাচিতে নাচিতে
চলিল। দুই পার্শ্বেই মধ্যে মধ্যে গ্রাম, দরিদ্র কুবকদিগের
বসতিস্থান, মেটে ঘরগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—কুবক-
মহিলাগণের নিয়মিত মাজা ঘসায় সকলই ঝক্ ঝক্ করিতেছে।
প্রত্যেক গৃহের চারিদিকে আম, কাটাল, নারিকেল, সুপারির
বাগান,—সেই সুন্দর সুন্দর গ্রাম্য বাগানের মধ্যে কুবকের গৃহ-
গুলি সুন্দর ছবির ছায়া শোভা পাইতেছে।

তীরে গোপাল বালকগণ উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় হাতে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দণ্ড লইয়া গো ভাড়াইয়া গৃহে ফিরিতেছে। কেহ কেহ
মনের সাথে গ্রাম গীতিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে
গ্রামের দিকে চলিয়াছে।

স্থানে স্থানে এ ও সে ঘাটে অবগুষ্ঠনবতী রমণীকুল জল
লইয়া কলসীকক্ষে উপরে উঠিতেছেন। কোন কোন স্থানে
বড় ছিপ ফেলিয়া কেহ কেহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জলের দিকে চাহিয়া
আছে। আবার কোন স্থানে বৃহৎ ছিপ মাটিতে প্রথিত রহিয়াছে।
তাহার স্রোতের অগ্রে বঁড়সিতে বিছ ক্ষুদ্র মৎস্য বস্ত্রণার ছটকট
করিতেছে;—দুই একটা বড় সাল বোয়াল মাছ তাহা গ্রাস

লক্ষী-সাত

করিয়া ইহলীলা সম্বরণের পথে বসিয়াছে। কোন স্থানে বৃক্ষ-পার্শ্বে ভীমরূপী মৎস্তঘাতক বড “টেঁটা” মস্তকের উপর তুলিয়া জলমধ্যস্থ মৎস্তের প্রাণ সংহারের জন্য উদ্গ্রীব ভাবে বিস্তারিত চক্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চারিদিকেই বিভিন্ন প্রকারে মৎস্ত আহরণের চেষ্টা!

এই সময়ে নৌকার পশ্চাত হইতে মাঝী বলিল,—“কর্ত্তা, হাট খোলায় ভিড়ি? আজ হাটবার দেখছি।”

বাবুদিগের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সে নৌকা ঘুরাইল,—দাঁড়িগণ দাঁড় তুলিয়া লগি ধরিল। তীরে রং বেরংজের বহুতর নৌকার সমাগম হইয়াছিল; কোনরূপে নৌকা ঠেলিয়া লইয়া তীরে লইয়া বাঁধিল। মাঝী নৌকার ছইয়ের উপর, দিয়া মস্ মস্ করিয়া আসিয়া সম্মুখে নামিল; বলিল,—“কর্ত্তা, একটা টাকা হুকুম করেন,—কিছু হাঠ বাজার করে লই।”

তিন বাবুই ছইয়ের অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নিশিবাবু হস্তপদ বিস্তৃত করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঠিন্ত্য দূর করণ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; মাঝীর আবেদন কর্ণগোচর হওয়ায়, তিনি পকেট হইতে একটা টাকা দিয়া বলিলেন,—“আমরাও হাট বাজার করিব।”

“আসেন কর্ত্তা” বলিয়া মাঝী তীরে নামিল। একজন দাঁড়ী গামছা কাপড় লইয়া তাহার সঙ্গে চলিল। নিশিবাবুও তাহার

নৌকায়

পশাৎ পশাৎ অবতীর্ণ হইলেন। বতীন ও অভুলবাবু তাঁহার আত্মগামী হইলেন।

হাটে প্রায় দুই সহস্র লোক সমবেত হইয়াছে। একটা বিপর্যয় গোল হাট হইতে আকাশে সমুৎখিত হইতেছে! দুই সহস্র লোক একত্রে এক সঙ্গে কথা কহিতেছে,—কেহ কেহ গলা পঞ্চমে তুলিয়া দ্রব্যাদির দর লইয়া মহা বিতণ্ডার নিযুক্ত হইয়াছে। হাটে কিছুই অভাব নাই। চাল ধান স্তপাকার হইয়াছে। সারি সারি মনিহারির দোকান বসিয়াছে,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে বেনে বেনাত দ্রব্য বেচিতেছে। নানাবিধ তরকারির সমাগম,—তাহার ভিতর সরু সরু লম্বা বেগুন,—বড় বড় মানকচু,—সাদা সাদা দিশি চাল কুমড়া,—লম্বা লম্বা বড় বড় লাউ,—সগাছ নিগাছ নানাবিধ পলাতুরও অভাব নাই!

মৎস্যও নানাবিধ আসিয়াছে। হাঁস, মুরগী, পাঁটা পাঁটাও বিক্রয় হইতেছে। নানা বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন রংয়ের বস্ত্র গামছা, চাদরও প্রচুর হস্তান্তরিত হইতেছে। তিন বজুতে হাটের চারিদিক পরিবেষ্টন করিয়া সকল দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে অপরিচিত বিদেশী দেখিয়া, অনেকেই তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সরকারি লোক ভাবিয়া সকলে সসম্মখে সরিয়া যাইতে লাগিল। কেহ কেহ বিনা কারণে হাত লম্বা করিয়া তাঁহাদের সেলামও দিল। বাহা হউক তাহার শাদ্যাদি রন্ধনোপযোগী সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া দাঁড়ীর স্বচ্ছন্দতায়

লক্ষ্মী-লাভ

করিয়া নৌকায় প্রত্যাবর্তিত হইলেন। কিয়ৎকালের পরেই মাঝীও তাহার বেগাতি করিয়া নৌকায় উঠিল, তখন নৌকা আবার তরতর করিয়া চলিল। সমস্ত রাত্রিই নৌকা চলিবে,—তবে যদি তাহার প্রাতে যতীনের বাড়ী উপস্থিত হইতে পারেন!

অপরূপ মুখের ধ্যান করিলে পেটের জ্বালা নিবারিত হইবে না ভাবিয়া, নিশিবাবু পাক কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। জাতি প্রধায় নিশিবাবুর তত আগ্রহ ছিল না,—তবুও তিন জনের মধ্যে তিনিই ব্রাহ্মণ,—সুতরাং তাঁহাকে যে পাচকরূপে পরিগত হইতে হইবে, তাহা তিনি বিশিষ্ট রূপে অবগত ছিলেন,—সুতরাং আর অনর্থক বাক্যব্যয় না করিয়া, মাটির উনানে কাষ্ট সংযোগ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিলেন। যতীনবাবু তরকারি প্রস্তুতে নিযুক্ত হইলেন, অতুলবাবু মাঝীর ক্ষুদ্র মৎস্যজাতিনী যন্ত্র খেলের নিচে হইতে টানিয়া বাহির করিয়া, মৎস্তের প্রাণ সংহারে নিযুক্ত হইলেন।

নূতন হাঁড়ীতে, নূতন চাল ডাল ;—তাহাতে যথেষ্ট ঝাল,—যথেষ্ট ঘৃত—নিশিবাবু অনতি বিলম্বে অতি উপাদেয় খিচুড়ী নামাইলেন। মৎস্ত, তরকারিও হইল, সকলই উপাদেয়। নৌকার উপর গামছা পাতিয়া, কলাপাতায় এই গভীর হলুদবর্ণ অর্ধ সিদ্ধ খিচুড়ী তাহার বেকর উপাদেয় ও মিষ্ট মনে করিলেন, তেমন সুখান্বিত তাহার আর কখনও জীবনে উপভোগ করেন

নৌকায়

নাই। পাতা ভগ্নে ফেলিয়া, কল কল শব্দ-কারিণী সুশীতল নদীর সুবিমল জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া তিন জনে সে গ্রাত্রের জন্ত নিদ্রাদেবীর শাস্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্ত শয্যাশায়ী হইলেন। কে কখন নিদ্রিত হইয়াছিলেন বল। যায় না, তবে অতুলবারু যে আত্ম পুলিসহস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দুই একবার নিশিবারুর নিশ্বাস প্রায় গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসে পরিণত হইল;—বতীনও বহুকণ ধরিয়া অন্ধকারে মিটি মিটি চাহিতে লাগিলেন। তাঁহারা কি কুক্ষণে লণিতবারুর গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাদা প্রাণে কে এমন করিয়া দাগা দিল!

তাঁহারা শয্যাশায়ী হইলে, মাঝী ও দাঁড়িগণ তাহাদের আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইল। মোটা লাল চালের বড় বড় ভাত হাঁড়ীশুদ্ধ নামাইয়া, “ছালন” চড়াইয়া দিল, বোয়াল মাছের খণ্ড, তাহাতে ফালা ফালা “কছু”;—তাঁহার উপর প্রায় অর্ধসের পিয়াজ ও লুকা,—উপাদেয় খাদ্য লালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সান্-কিতে অবতীর্ণ হইল। তখন তাঁহারা একস্থানে নৌকা বাঁধিয়া আহাৰ্য্য কার্য্য শেষ করিয়া গেল।

কখন তাঁহারা নৌকা ছাড়িয়া ছিল,—তাঁহা বতীন ও নিশি-বারু জানেন না। নূতন প্রেমের নূতন ভূকানে ভাসিতে ভাসিতে,

লক্ষী-সাত

তাহারা কখন যে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তাহাও তাঁহারা জানিতেন না। রাত্রে বেশ বাতাস উঠিয়াছিল; সেই স্র-বাতাসে মাঝী পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছিল, সঁ।সঁ।শকে নৌকা ছুটিয়া ছিল। যে পথ বাইতে ১২।১৪ ঘণ্টা লাগিত, তাহাই নৌকা ৬।৭ ঘণ্টায় আসিল, তখন দাঁড়ীমাঝিগণ এক ঘাটে নৌকা বাধিয়া নিজেরাও পাল মুড়ি দিয়া নিজা দিল।

নিশিবাবু ও বতীন তখন গভীর নিদ্রায় স্রুথের স্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন। পাছে সে স্বপ্ন নিমিষে ভাঙ্গিয়া যায় তাই তাঁহার নিদ্রায় মহান কোলে এমনি গাঢ় ভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন যে নৌকা কখন ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে তাহার বিন্দু বিসর্গও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই।

অতি ভোর রাত্রে বতীনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, নদী-তীরে নৌকা বাধা রহিয়াছে! কোথায় মাঝী নৌকা বাধিয়া রাখিয়াছে, তাহা তিনি প্রথম স্থির করিতে পারিলেন না। নিঃশব্দে বাহিরে আসিলেন; তৎপরে অতি বিষয়ে বলিয়া উঠিলেন, “এবে আমাদেরই ঘাট!”

এই সময়ে উপরে কে বলিল, “বতীন যে।”

বতীনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গাডু হস্তে ঘাটে আসিয়া ছিলেন; তাঁহার সঙ্গে স্নেহের ভগিনী স্রুপ্রিয়া। সে ভ্রাতাকে দেখিয়া “দাদা এসেছ,” বলিয়া ছুটিয়া নৌকার নিকট আসিল।

• নৌকার

তাহার মধুর কণ্ঠ স্বরে নিশিবাবু ও আব্দুলবাবু সম্বর শব্দা
হইতে উঠিয়া বসিলেন। স্বভীন ভীরে নাশিয়া, সুপ্রিয়ার হাত
ধরিয়া বলিলেন, “হাঁ—পত্রে তো সব লিখেছিলাম।”

রুচ্ছেদ

শুভ-সংবাদ

অতুলবাবু আসিয়াছেন,—মৰ্কটমা জিত হইয়াছে,—তাহার উপর নিশিবাবু আসিয়াছেন ;—বতীনদিগের ক্ষুদ্র গৃহে একটা হল্পুপুল পড়িয়া গেল। তাঁহার। অতি গৃহস্থ লোক—সামান্য বাড়ী ঘর। তবে ধান চাল, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব নাই ; বিশেষতঃ তাঁহাদের বড়ই জ্বরের সংসার। সকলে অতি সমাধরে সকলকে গৃহে অভ্যর্থনা করিলেন, নিশিবাবুর আদরের পরিসীমা রহিল না, তাঁহার সমস্ত কথাই বতীন পূর্বে পত্রে লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার। বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জনার্দন শৰ্ম্মা মহাশয়কে মুখখোঁত কার্যে নিযুক্ত দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইলেন। সহসা ললিতের বাড়ী হইতে ইনি এখানে কেন,—কবে আসিলেন। বতীনের হৃদয় প্রকৃতই সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল ! কেন তাহা তিনি জানেন না।

নিশিবাবু সহসা কিছুতে বিস্মিত হইতেন না,—কিন্তু ললিতের পিতা চৌধুরী মহাশয়ের পার্শ্বচর জনার্দন শৰ্ম্মাকে সহসা এখানে দেখিয়া বিশেষতঃ তাঁহাদের এখানে উপস্থিত হইবার পূর্বে এখানে তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া তিনিও বিশেষ বিস্মিত হইলেন। উভয়ের এই বিস্ময় ভাব দেখিয়া জনার্দন শৰ্ম্মা হাসিতে হাসিতে

বলিলেন,—“ভায়া, আমাকে তোমাদের আগে এখানে উপস্থিত হতে দেখে, বড় আশ্চর্য্য হইতেছ.—না ? সম্ভ্রান্তি ঘটকালী কার্য্যে নিযুক্ত আছি !”

ষতীন ও নিশিবাবুর হৃদয় স্পন্দন অধিকতর বৃদ্ধি পাইল, তাঁহারা কোন কথা কহিতে পারিলেন না ; উভয়েই জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তিনি বলিলেন, “নিশিবাবু কি ষতীনের বিবাহের কথা শুনে নাই ?”

নিশিবাবু মস্তক কুণ্ডলনপর হইয়া বলিলেন, “আজ্ঞে শুনেছি।”

ষতীনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, “নিশিবাবু, আমরা গৃহস্থ লোক, নদিয়ার বিখ্যাত জমিদার চৌধুরী মহাশয় যে ষতীনের সঙ্গে তাঁহার একমাত্র কস্তার বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছেন, ইহা কি আমাদের পরম সৌভাগ্য নয় ?”

অবনত মস্তকে নিশিবাবু বলিলেন, “নিশ্চয়ই।”

ষতীনের দাদা পুনরায় বলিলেন, “এ সকলই ললিতবাবুর কাজ। তিনি ষতীনকে বড় ভালবাসেন। কেবল ইহাই নহে— তাঁহার সহিত স্মৃষ্টিয়ার বিবাহ স্থির হইয়া পিয়াছে। অনেক দিন ইহা স্থির হইয়াছে, আমরা তো টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম।”

ষতীন আনন্দে প্রায় উগ্ৰস্ত হইলেন, বলিয়া উঠিলেন,— “ললিত স্বধার্ম্ম কি “স্নকে” বিবাহ করিবে ? নিশ্চয়ই আমাদের পরম সৌভাগ্য ! কিন্তু আশ্চর্য্য ! তিনি আমাদের কোন কথাই বলেন নাই।”

লক্ষ্মী-লাভ

“বাড়ী আসিয়া শুনিবে বলিয়া বলেন নাই। সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বড় লোক,—আমাদের “স্নুকে” তাঁহাদের বাড়ী লইয়া বিবাহ দিতে হইবে,—আর তোমারও বিবাহ সেই-খানেই হইবে,—দিন স্থির হইয়া গিয়াছে।”

নিশিবাবু বলিলেন, “ইহাপেক্ষা স্নুকের সম্বাদ আর কি হইতে পারে! ললিতবাবু ভগিনীপতি হইবেন,—এটা নিতান্তই সৌভাগ্য! আর বতীনও বাহাকে বিবাহ করিবে, তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি,—তিনি রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী! বতীন অতি সৌভাগ্যবান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিদেশে আসিয়া যে এত আনন্দ লাভ করিব, তাহা কখনও আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।”

জনার্দন শর্মা বলিয়া উঠিলেন, “ভায়া, ঐখানেই উভাহ কার্যের উপসংহার নহে।”

সকলেই জনার্দন শর্মার মুখের দিকে চাহিলেন;—নিশিবাবু বলিলেন, “তাতো নিশ্চয়ই নয়,—বধেট্ট মিষ্টি মুখ আছে।”

জনার্দন শর্মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তবে কাহারও কাহারও সে দিন উপবাসও করিতে হইবে।”

“হঁা নিশ্চয়ই,—বর কনের।”

“বন্ধুরও বটে।”

নিশিবাবু এবার নিতান্ত বিস্মিত ভাবে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলেন। তখন জনার্দন শর্মা গুরু গভীর ভাবে আরম্ভ

করিলেন, “আমি ঘটকালী করিতে এখানে আসিয়াছি। চৌধুরী মহাশয়ও ললিতবাবু পাঠাইয়াছেন। ভায়া,—তোমাকে সার্বভৌম মহাশয়ের অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন দৌহিত্রী পত্রলেখাকে বিবাহ করিতে হইতেছে। ইহাতে ‘না’ বলিলে চলিবে না। আমরা সকলে জোর করিয়া তোমার সঙ্গে পত্রলেখার বিবাহ দিব।”

জীবনে আর কেহ কখনও নিশিবাবুর এ অবস্থা দেখে নাই। তিনি বিস্ফারিত নেত্র,—গলদবর্ষ কলেবর,—রক্তিমাত মুখ,— তাঁহার শিরার রক্ত ডাক পাড়াকে পরাভূত করিয়া তীরবেগে প্রধাবিত হইতেছে। তিনি অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, “বলেন কি?”

জনার্দন শর্মা বলিলেন,—“নূতন কিছুই বলিতেছি না।— পত্রলেখা তোমারই উপযুক্ত পাত্ৰী,—আমরা সকলে পড়িয়া তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। কর্তা ঠাকুরাণীর অনুমতি আনিবার জন্য চৌধুরী মহাশয় তোমার বাড়ীতে লোক পাঠাইয়াছেন। তিন বিবাহই এক সময়ে হওয়া আবশ্যক।”

নিশিবাবু মন্তক কুণ্ডলন করিতে করিতে বলিলেন,—
“প্রস্তাবটা বড় হঠাৎ হলো,—না?”

জনার্দন শর্মা স্তম্ভিত ভাবে বলিলেন,—“হঠাতই হউক আর বাই হউক তোমাকে এ বিবাহ করিতেই হইতেছে।”

বতীন মুহু হাসিয়া বলিলেন,—“আমি জানি নিশির এ বিবাহে আপত্তি হইবে না।”

অন্তত্ৰ হইলে নিশিবাবু মুঠাঘাতে বতীনের মস্তকধারণাধার

লক্ষী-স্বাভ .

চূর্ণবিচূর্ণকৃত করিতেন,—কিন্তু নিমিষে আত্মসংব্রম করিলেন।
'পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ' অবস্থা যাহার কখনও হইয়াছে,
তিনিই নিশিবাবুর অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবেন—অন্তের
সম্ভবে না। এতদিনে নিশিবাবু প্রকৃতই নীরব মুখচোরা হইতে
বাধ্য হইলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিসৃত হইল না।

জনার্দন শর্মা নাছোড়বান্দা,—বলিলেন,—“আমাকে আজই
আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে,—কেমন ভায়া সম্মত
আছে তো?”

নিশিবাবু নীরব। জনার্দন শর্মা বহুপরিকর,—তিনি
আবার বলিলেন,—“কেমন ভায়া সম্মত আছে তো? তোমার
মুখের কথা লইয়া আমাকে ফিরিতে হইবে! তোমার পিতামহী,
কর্ত্তা ঠাকুরাণী কখনই চৌধুরী মহাশয়ের অমুরোধ ঠেলিয়া
ফেলিতে পারিবেন না। এখন তোমার কথা পাইলেই
হয়।”

যতীন বলিলেন,—“বলই না ছাই।”

ইহাতে নিশিবাবু রক্তিম নয়নে তাঁহার দিকে চাহিলেন।
তখন বাড়ী শুদ্ধ লোক নিশিবাবুর উপর অমুরোধ ধারা বর্ষণ
করিতে আরম্ভ করিলেন। সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমত্বে অবস্থায়
নিশিবাবু নীত হইলেন। অবশেষে অবনত মস্তকে, হেট মুণ্ডে,
অতি মৃদু স্বরে বলিলেন,—“কাজেই!”

জনার্দন শর্মা সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—“বাক,—আমার

ভক্ত-সম্বাদ

ঘটকালী কাজ শেষ হইল। এক পেট মোণ্ডা খাইতে পারিলেই ব্রাহ্মণ খুসি ! ভায়া ঘটক বিদায়টা যেন মনে থাকে ।”

জনার্দন শর্মা তাঁহার মন্থন উদরে সাদরে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। আজ সকলেরই আর আনন্দের সীমা নাই। ভগবান যে ভিতরে ভিতরে এত সুখের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে-ছিলেন, তাহা তিনি ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। যতীনের বিবাহে আপত্তি এক নিমিষে প্রাবীটের নদী বক্ষস্থ বৃক্ষ পত্রের ত্রায় কোথায় তাসিয়া গেল। নিশিবাবু ললিতবাবুর বাড়ী আসিয়া বাল্য বিবাহের পক্ষপাতি হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে নিশিবাবুর সহিত যতীনের বিবাহ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। .

প্রিয় ভগিনী সুপ্রিয়া প্রাণের বন্ধু ললিতের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া কত আদরের রাজরাণী হইবে,—হীরকালঙ্কারে মণ্ডিত হইবে,—কত সহস্র সহস্র দীন দুঃখির দুঃখ দূর করিতে পারিবে, ইহাপেক্ষা সুখের সম্বাদ আর কি হইতে পারে। যতীন আরও তনিলেন ধন কুবের চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীর বিবাহের সমস্ত ব্যয় নিৰ্ব্বাহ করিবেন, তাঁহাদের এক পয়সাও লাগিবে না। অধিকন্তু তিনি কত্নাকে ২৫ হাজার টাকার বাৎসরিক আয়ের একটি বিষয় ও প্রায় লক্ষ টাকার অলঙ্কারাদি দিবেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জামাতার মৰ্জ্জাদা হিসাবে প্রায় লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। কাল যতীন দরিদ্র ছিলেন, আজ তিনি বড় লোক !

লক্ষী-লাভ •

কাহার নিকট তিনি ইহার জন্য কৃতজ্ঞ হইবেন ? ভগবানের উপর,—বহু ললিতের উপর,—না ললিতের সেই উন্নত বেগবান অশ্বের উপর ? সে খেপিয়া গাড়ী লইয়া না ছুটিলে, তিনি প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে না ধরিলে, তাহার সহিত ললিতের কখনই বন্ধুত্ব হইত না ; আজ তাহার এ আনন্দের দিনও আসিত না । অলঙ্কে থাকিয়া ভগবান বাহা করেন, তাহার উপর কাহারই হস্ত নাই ।

নিশিবাবু পর দিনই দেশে পালাইলেন । তাহার পিতা মাতা নাই,—এক অতি বৃদ্ধা পিতামহী আছেন ; স্মৃত্যায় তাহাকেই সব করিতে হইবে । যে কারণেই হউক, পর দিনই তিনি দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন । এদিকে মহা সমারোহে বতীন ও স্মৃতিয়ার বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল । টাকার আর অপ্রভুল নাই । কয়দিন বাইতে না বাইতে, উচ্চ নহবৎ খানায় রসুনচৌকি মধুর ধ্বনিতে ধ্বনিত হইতে লাগিল । সানাই ইমন কল্যাণে প্রাণ মন মাতাইয়া তুলিল ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মধুরেণ

আজ এক সপ্তাহ হইতে চৌধুরী মহাশয়ের বিস্তৃত পুরীর চারিদিকে চারি নহবত থানা লাল নীল নানা রঙের নান পতাকার, নানা রং বেরংয়ের রংচংয়ে কাগজে, মুসলমানী মসজিদাকারে বিরাজমান হইয়াছে। তাহা হইতে সানাইয়ের মুখে অবিরল ধারে নানা রাগিনী প্রধাবিত হইতেছে। স্থানে স্থানে ঢাক ঢোল কাশিওয়ালগণ প্রাণপণ শক্তিতে মধুর বাজে চারিদিক আলোড়িত করিয়ু ভুলিতেছে। গ্রাম্য মুচে ইংরাজি, বাদ্যকরগণ ছিন্ন পরিতক্ত ফাঁকালে রংয়ে রঞ্জিত নানা ভাবের ইংরাজি পোষাক ও টুপিতে সজ্জিত হইয়া, তাহাদের জগবল্লী বাজাইতেছে। কলিকাতা হইতে ভাল ইংরাজি বাদ্যকরও আসিয়াছে,—তাহারা লগিতবাবুর সুন্দর বৈঠকখানা বাড়ীর মারবেল মণ্ডিত বারান্দা অধিকার করিয়া মধ্যে মধ্যে রণবাদ্য বাজাইতেছে। কোন স্থানে বাদ্যের বিরাম হইলেই “বাজা বাজা” শব্দ উঠিতেছে। চারিদিকে একটা হৈ হৈ ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে।

এক স্থানে মালাকারগণ রাশি রাশি বাজী প্রস্তুত করিতেছে।
—এক স্থানে ভি়ানে প্রায় শতাব্দিক ব্রাহ্মণ নানা মিষ্টান্ন প্রস্তুত

লক্ষী-লাভ

নিযুক্ত রহিয়াছে ! শত শত নূতন দরমাস ঘর নির্মিত হইয়াছে । তাহাতে জপাকার দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে—একপ বিপুল ব্যাপার আর কেহ কখনও দেখেন নাই । সহস্র সহস্র লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে,—প্রত্যহই “যোগ্যি” চলিতেছে ।

আমোদ প্রমোদেরও অভাব নাই । বাগিরে মাঠে দিন রাত্রি পুতুল নাচ চলিতেছে । মাটির পুতুল কোমর নাচাইয়া নাচিতেছে রাবণ বধ ঘটিতেছে,—স্থপনথার নাক কাটা বাইতেছে । অপর দিকে মেয়ে কবিগণ খেঁউড়ের ভূফান ছাড়িয়া দিয়াছে । মিঞা সাহেবগণ মহানন্দে “আরও মোটা ধর” বলিয়া চীৎকার করিতেছেন । নানা স্থান হইতে ভাল ভাল বাত্রার দল আসিয়াছে । কলিকাতা হইতে খেমটাওয়ালো আসিয়াছে ;—লঙ্কো হইতে বাইজী আসিয়া ঠুংরি ধরিয়াছেন । চৌধুরী মহাশয়ের এই প্রথম কার্য,—আর ইহাই তাঁহার শেষ কার্য, স্মৃতরাং তিনি অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হইতেছেন না,—জলের জায় টাকা ব্যয় হইতেছে ।

মহা সমারোহে ললিতবাবু ও স্বতীনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে,—আজ নিশিবাবুর বিবাহ । এ বিবাহও চৌধুরী মহাশয় নিজের কন্যার বিবাহ মনে করিয়া, সেইরূপই ব্যয় ভূষণ করিতেছেন । তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা ছিল যে তিনি নিজের বাড়ীতে পত্রলেখার বিবাহ দেন,—সার্বভৌম মহাশয়ও তাহাতে সৰ্ব্ব প্রকারে সম্মত ছিলেন, কিন্তু নিশিবাবু কিছুতেই সম্মত

হইলেন না। তাঁহার সকল কার্যেই একটু পাগলামি আছে। তিনি বিবাহ করিতে আসিয়া এক পাগলামি জুড়িলেন। প্রথম বিবাহ সার্বভৌম মহাশয়ের সেই বাহিরের ঘরের দাওয়ায় হওয়া চাই,—দ্বিতীয়তঃ তিনি যে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া পলাতক হইয়াছিলেন, যে পট্টবস্ত্র পরিয়া তিনি গুরু হইয়া চৌধুরী মহাশয়ের পূজা বাটীতে উপস্থিত হইয়া ছিলেন,—সেই পট্টবস্ত্র পরিয়া তিনি বিবাহ করিবেন,—আর কিছুই পরিবেন না।

চৌধুরী মহাশয় এই অহাদৃত্ত অমুরোধে নিতান্ত বিব্রিত হইলেন,—কিন্তু লগিতবাবু ও বতীন ব্যাপার বুঝিয়া মনে মনে হাসিলেন। নিশিবাবু একে গুরুঠাকুর, তাহার উপর বড় লোকের ছেলে, তাহাতে লগিতের বিশেষ অমুরোধ,—চৌধুরী মহাশয় আর কোন কথা কহিলেন না, নিশিবাবুর পাগলামিতেই সায় দিলেন। নিশিবাবুরই জয় হইল। তিনি সেই প্রাচীন পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, সেই একদিন বৈরুপ ভাবে সার্বভৌম মহাশয়ের সুন্দর পুষ্পোদ্যানে দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন, আজও সেই ভাবে সেই বাগানে বিবাহের ছান্দাতলায় দণ্ডায়মান হইলেন। গ্রামের রূপসীগণের নিকট একদিন তিনি গুরু-ঠাকুর ছিলেন,—সে দিন প্রণামের উপর প্রণাম লাভ করিয়া ছিলেন; আজ তিনি আর গুরুঠাকুর নহেন, গ্রামের বর গ্রাম্য ললানাগণ সেই দিনকার প্রণামের প্রতিশোধ লইবার

লক্ষী-লাভ

জনাই বোধ হয়, আজ নিশিবাবুর কর্ণধরের বিশেষ সমাদর আরম্ভ করিলেন। নিশিবাবুর প্রবণেন্দ্রিয় ক্রমে লাল হইতে ধোরতর লাল হইয়া উঠিল। এ কার্যে সকল অপেক্ষা বোধ হয় তৎপর হইয়াছিল ললিতবাবুর ভগিনী সুবালা!

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, নিশিবাবু স্বর একটু উচ্চে তুলিয়া বলিলেন,—“আমি জুয়াচোর হইলেও চোর নই, এরূপ কানমলা চোরেও সহ্য করিতে পারে না।”

ললিত বাবুর ভগিনী সুবালা পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, সে মুহু হাসিয়া অতি মধুর স্বরে বলিল,—“তুমি তো চোরই,—যে সে চোর নও,—চোর গোপনে চুরি করে আর তুমি এত লোকের সম্মুখেই আমার সখীর প্রাণটা চুরি করিতে আসিয়াছ।”

চারিদিক হইতে আবার প্রবল বেগে কানমলা আরম্ভ হইল, নিশিবাবু অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি কর্ণের আলা চাকবার লজ্জা আবার রসিকতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বহু চেষ্টায়ও তাঁহার কণ্ঠ হইতে আর একটাও বাক্য বাহির হইল না। তাঁহার প্রাণের ভিতর কি একরূপ ভাব হইতে লাগিল, বুকের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—“কত আসরে আমার রসিকতার তরঙ্গে শত শত লোক দিশেহারা হইয়াছে আর আজ এক দুঃখপোষা বালিকার সম্মুখে আমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল কে?”

যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। গাঁটছড়ার আবদ্ধ হইয়া

অন্য

পত্রলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিশিবাবু বাসর-গৃহে প্রবেশ করিলেন।
তথায় পদে পদে লাক্ষিত ও অপদস্থ হইয়া তিনি হাড়ে হাড়ে
বুঝিলেন যে, যে যতই বিধান, বুদ্ধিমান, সূচত্বর হউক—এই
নারীরাজ্য বাসর-ঘরে তাহাকে পদে পদে ঠকিতে হইবেই
হইবে,—এখানে পুরুষের জিতিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

আমাদের বাহাদের লইয়া প্রয়োজন তাহাদের সকলেরই
যখন বাহা হউক একটা হেস্তনেস্ত হইয়া গেল,—তখন আর
আমাদের বলিবার অধিক কিছুই নাই। যথা সময়ে নিশিবাবু
পত্রলেখাকে লইয়া এবং যতীন সূবালাকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে
মহা সমারোহে রওনা হইলেন। বিদায় কালীন অশ্রু আর
আমরা বর্ণনা করিব না,—অশ্রু লইয়া আমাদের কারবার নহে,—
বাহার অশ্রু ভালবাসেন তাঁহারাই অশ্রু লইয়া থাকুন। এ
সুখের সংসারে—সোণার সংসারে নিশিবাবুর ও যতীনের
লক্ষ্মী-লাভ হইল, এ সুখের দিনে,—হাসির দিনে অশ্রু কেন ?

